ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ও উর্দু বিভাগের অধীনে এম.ফিল গবেষণার থিসিস।

"ইসলামী বীমার ক্রমবিকাশঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. জাফর আহমদ ভূইয়া

সহযোগী অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান

উর্দু বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষক

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

রোল নং- ১৭

এম.ফিল ২য় বর্ষ

শিক্ষাবর্ষ- ২০০১-২০০২

ফার্সী ও উর্দু বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

RB
B
368
MAI

Dhaka University Institutional Repository

404140

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ও উর্দু বিভাগের অধীনে এম.ফিল গবেষণার থিসিস।

"ইসলামী বীমার ক্রমবিকাশঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া
সহযোগী অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান,
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library
404140
404140
GIFT

গবেষক
মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
রোল নং- ১৭
এম.ফিল ২য় বর্ষ
শিক্ষাবর্ষ- ২০০১-২০০২
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ফার্সী ও উর্দু বিভাগের অধীনে এম. ফিল গবেষক জনাব মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান কর্তৃক এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত "ইসলামী বীমার ক্রমবিকাশ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে ইতিপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এর শীরোনামে এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে গবেষণা সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা সন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপির আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

404140

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

২৭.৪.০৭

তত্ত্বাবধায়ক
ড. জাফর আহমদ ভূইয়া
সহযোগী অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান
উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, "ইসলামী বীমার ক্রমবিকাশ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

মোঃ মাহবুবুর রহমান
এম. ফিল গবেষক
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০।

404140

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকাল প্রশংসা মহান সৃষ্টিকর্তার জন্যে, যিনি তার সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করেছেন। সে আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি, যার পরম করুণায় **"ইসলামী বীমার ক্রমবিকাশ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** শীর্ষক গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভটি শেষ করতে পেরেছি।

আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া, সহযোগী অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, ফার্সী ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি সব সময়ই মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির কাজে সহযোগিতার জন্যে আমি তার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও যাদের গবেষণামূলক লিখা থেকে বিভিন্নভাবে বিশেষ সহযোগিতা লাভ করেছি তাদের নাম উল্লেখ না করে পারছিনা। তারা হলেন ড. মাসুম বিল্লাহ্, মাওঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, এ. জেড. এম. সামসুল আলম, ড. আ,ই,ম নেছার উদ্দিন, এম. এ. সামাদ ও কাজী মুর্তুজা আলী। তাদের বই পত্র, বিভিন্ন থিসিস পেপার ও জার্নালের মাধ্যমে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। আমি তাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমার এ গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্যে যারা আমাকে সর্বদা উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছেন এবং সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ও উর্দুবিভাগের অধ্যাপক ড. কুলসুম, আবুল বাশার মজুমদার ও আরবী বিভাগের অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান নিজামী। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্পাকের দরবারে আমি তাদের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

আমার এ গবেষণা কর্ম চালাতে গিয়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার থেকে উপাত্ত ও উপকারণ সংগ্রহ করেছি তম্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, বাংলাদেশ ইন্সিউরেন্স একাডেমির লাইব্রেরী, বাংলাদেশ ইন্সিউরেন্স লাইব্রেরী মতিঝিল, ইসলামী ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমিক লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, শাহবাগ পাবলিক লাইব্রেরী সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যারদের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী অন্যতম। বিশেষ করে বাংলাদেশ ইন্সিউরেন্স

Dhaka University Institutional Repository

একাডেমির লাইব্রেরী থেকে আমি এ বিষয়ে অনেক সহযোগিতা লাভ করেছি। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সর্বশেষ আমার বাবার রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। আমার মা ও পরিবারের আপনজন যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে আন্তরিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান, উৎসাহ দান, কল্যাণ কামনা ও দোয়া করেছেন, যার ফলে আমার পক্ষে থিসিস শেষ করা সম্ভব হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ কথা

প্রচলিত সুদী বীমা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান বিশ্বে অভূতপূর্ব সাফল্যের সোপান রচনা করতে সক্ষম হয়েছে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা। বিংশ শতাব্দির মধ্যবর্তী সময়পর্যন্ত মুসলিম উম্মার নিকট যা স্বপ্ন ছিল আজ তা শুধু বাস্তবই নয় বরং সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রচলিত সুদী বীমা অপেক্ষা অনেক দূর এগিয়েছে। এত দিন মানব মনে প্রশ্ন ছিল সুদ ছাড়া অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব? বর্তমানে অর্থ ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদবিহীন ইসলামী ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ ও সাফল্য মানব মনের সে সন্দেহ ও সংশয়ের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছে এবং এ কথাও প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, সুদবিহীন ইসলামী ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে অর্থ ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি। ইসলামী বীমা বলতে এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বুঝায় যার আইন কানুন, কর্মপদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য থেকে শুরু করে সার্বিক বিষয়সমূহ ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত। যার মধ্যে কোন প্রকার সুদ, জুয়া ও প্রতারণার সংশ্রব থাকে না।

ইসলামী বীমা ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী বীমা ছাড়া ইসলামী অর্থনীতি পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এ বীমা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করার কর্ম কৌশল নিয়েই আমার থিসিস **"ইসলামী বীমার ক্রমবিকশ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ"**।

গবেষণার অভিসন্দর্ভটির ভাব সৌন্দর্য ও অবয়ব সুন্দর ও সুচারুরূপে বিন্যাস করার নিমিত্তে এর বিষয়বস্তু ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া মোট চারটি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে বীমার সংজ্ঞা, সূচনাও ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষপট বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামী বীমার বিকাশ ধারার পর্যায়ক্রমিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইসলামী বীমার ক্রমবিকাশ ও বীমা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা ও ত্রুটির উল্লেখপূর্বক এর সম্ভাব্য সমাধানমূলক প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে।

সর্বশেষে একটি উপসংহারের মাধ্যমে এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি শেষ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ ইসলামে নিষিদ্ধ; কিন্তু লাভ লোকসানের অংশিদারিত্বে বিনিয়োগ ইসলামে অনুমোদিত। ইসলামী বীমাব্যবস্থা সুদের পরিবর্তে লাভ লোকসানের অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে উপর্জনের চেষ্টা করে। ইসলামী বীমার সকল ধরণের আর্থিক কার্যক্রম বিনিয়োগমূলক, ঋণ ভিত্তিক নয়। এছাড়া ইসলামী বীমা শুধুমাত্র ব্যবসা ও মুনাফা অর্জনকেই চুড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারন করেনি। একজনের বিপদে অন্যজনকে শরীক করে সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে মানবতার সেবা করাই এর চূড়ান্ত লক্ষ্য। ইসলামী বীমা ব্যবস্থার আরো একটি উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কায়েম করা।

প্রচলিত সুদী বীমাগুলো শুধু আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামী বীমাগুলো একাধারে আর্থিক ও সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানমূলক প্রতিষ্ঠান। ইসলামী বীমা শুধু সুদ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ও বিলোপ সাধনের মধ্যেই এর কার্যক্রম শেষ করে না। বরং ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে মানুষের চারিত্রিক, নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে বাস্তব সম্মত প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিশেষে একথা বলতে চাই ইসলামী নীতিমালা অনুস্মরণের মাধ্যমেই সমাজে সম্পদের সুষম বণ্টন, শোষণের অবসান, আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচারের সুফল জনগণের দোর গোড়ায় পৌছে দেয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব।

গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা ঃ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মানুষকে বাস করতে হবে পৃথিবীতে। জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজন খাদ্য। খাদ্য সংগ্রহে প্রয়োজন অর্থ। এ অর্থ উপার্জনের নিয়মাবলীই অর্থনীতি। এ অর্থনীতির ব্যবস্থা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ তায়ালা এ পৃথিবীকে মানুষ বসবাসের উপযোগী করে দিয়েছেন এবং জীবন ধারণের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সূরা বাকারার ৩৬ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন-

ولكم في الارض مستقرو متاع الي حين.[১]

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য পৃথিবীতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থিতি অবস্থান ও জীবনোপকরণ রয়েছে।

মানুষের জন্য জীবনোপকরণ স্বরূপ আল্লাহর দেয়া রিযিক বিশ্বের বুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ ছড়িয়ে থাকা রিযিক মানুষকে সংগ্রহ করতে হবে।

বর্তমান বিশ্বের মানুষ নিদারুণভাবে শোষিত, বঞ্চিত ও জর্জরিত। একদিকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত মালিকানার নামে মানবতার উপর চরম জুলুম, শোষণ ও নির্যাতন চলছে। মুষ্টিমেয় লোক পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে সমাজের শতকরা নব্বই ভাগ ধন-সম্পদ দুষ্ট হাতে লুটে খাচ্ছে, অন্যান্য মানুষকে দারিদ্রের অতল গহবরে নিক্ষেপ করছে এবং ভোগ বিলাস পাশবিক পরিতৃপ্তি আকাশচুম্বী প্রাসাদ গড়ছে। মানুষের মাঝ থেকে এ বৈষম্য দূর করতে পারে একমাত্র ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা। ইসলামী জীবন বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের জীবন নিরাপত্তা ও সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান করা সম্ভব।

হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল হালাল পথে রিযিক অন্বেষণ করেছেন। যেমন- আদম (আ) চাষাবাদ শুরু করেছেন। হযরত নুহ (আ) নৌকা তৈরি করেছেন। হযরত দাউদ (আ) অলংকার তৈরি করেছেন। হযরত মূসা (আ) ছাগল পালন করেছেন। শেষ নবী রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) মদীনার বাইরে সিরিয়াতে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা করেছেন। আল্লাহর রাসূল (স) নিজেই বলেছেন সততা ও একনিষ্ঠতার সাথে ব্যবসা করে উপার্জনকারী আল্লাহর বন্ধু। এ বিশ্বকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ-ব্যবস্থার স্বরূপ দেখিয়েছে ইসলাম। তাই ইসলামী অর্থ-ব্যবস্থাই হল মানবতার অর্থ-ব্যবস্থা। হযরত আদম (আ)-এর চাষাবাদ থেকে শুরু হয় এ অর্থ-ব্যবস্থার সূচনা। সে অর্থ-ব্যবস্থা আজকে চরম উন্নতির শিখরে পৌঁছে যায়। বর্তমানে প্রচলিত বীমা-ব্যবস্থা আধুনিক অর্থনীতির একটি দিক। তাই বীমা শিল্পকে কিভাবে ইসলামী রীতিতে রূপান্তরিত করা যায়, এ নিয়েই আমার প্রবন্ধের শিরোণাম "ইসলামী বীমার ক্রম-বিকাশ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ।"

---

[১] আল কুরআন, সূরা আল বাকারা, আয়াত- ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায় ঃ বীমার সূচনা ও ক্রমবিকাশ-	০১ - ২৩
০১	বীমার সংজ্ঞা	০১
০২	বীমার সূচনা ও ক্রমবিকাশ	০৫
০৩	ভারতীয় উপমহাদেশে বীমা	১২
০৪	বিংশ শতাব্দীতে বীমা	১৪
০৫	বিশ্ব যুদ্ধ ও বীমা	১৬
০৬	উপমহাদেশে বীমার পথিকৃৎগণ	১৭
০৭	পাকিস্তান আমল	২১
০৮	বাংলাদেশ ও বীমা	২২
	দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইসলামী বীমার বিকাশধারা	২৪ - ৬০
০৯	ইসলামী বীমা সম্পর্কে ধারনা	২৪
১০	নবুয়ত প্রাপ্তির পরবর্তী জীবন	২৯
১১	ইসলামী বীমার উৎস সমূহ	৩৭
১২	ফকীহ্ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে বীমা	৪০
১৩	ইসলামী বীমার উপর সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম	৪৪
১৪	ইসলামী বীমার উপর সংসদীয় আইন	৪৪
১৫	ইসলামে শ্রমনীতি	৪৫
১৬	ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার	৫১
১৭	আদর্শ শ্রমিকের গুণাবলী	৫৩
১৮	বিংশ শতাব্দীতে ইসলামীক ইন্সিউরেন্স	৫৪
	তৃতীয় অধ্যায় ঃ বাংলাদেশে ইসলামী বীমার ক্রমবিকাশ	৬১ - ১০২
১৯	বাংলাদেশে ইসলামী বীমা	৬১
২০	ইসলামী রি-ইন্সিউরেন্স	৬৪
২১	ইসলামী রি-ইন্সিউরেন্স কোম্পানীর তালিকা	৬৬
২২	ইসলামী বীমা পদ্ধতিতে পুন:বীমা	৬৮
২৩	ইসলামী বীমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৭০
২৪	ইসলামী বীমার সাধারন বৈশিষ্ট্য	৭১
২৫	ইসলামী আইনে বিনিয়োগ পদ্ধতি	৭৩
২৬	তাকাফুল	৭৮
২৭	ইসলামী বীমা ও তাবাররুউন	৮৩
২৮	বীমার মূলনীতি	৮৫
২৯	ইসলামী বীমার মূলনীতি	৮৭
৩০	সঞ্চয় ও উত্তরাধিকার	৮৯
৩১	ইসলামী বীমা ও সুদী বীমার মধ্যে পার্থক্য	৯৪
৩২	বিশ্বে প্রচলিত ইসলামী বীমার তালিকা	৯৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইসলামী বীমার সমস্যা ও সমাধান ১০৩ - ১৫৪

৩৩	বর্তমান বিশ্বে বীমা সম্পর্কে ইসলামী গবেষকদের মতামত	১০৪
৩৪	সুদ সম্পর্কে ইসলামের বিধান	১০৫
৩৫	সুদ ও বীমা	১১১
৩৬	জুয়ার শরয়ী বিধান	১১৭
৩৭	সাধারণ বীমা ও ইসলাম	১২২
৩৮	তাওয়াক্কুল ও বীমা	১২৬
৩৯	বীমা ও মীরাস	১৩২
৪০	ইসলামী বীমা ও আল-ঘারার	১৩৩
৪১	শরীয়াহ্ কাউন্সিল	১৩৮
৪২	ইসলামী বীমার আইনগত ভিত্তি	১৪১
৪৩	আইনগত ও দক্ষতাজনিত সমস্যা	১৪৪
৪৪	বাংলাদেশে ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে আর্থ ও সামাজিক সমস্যা	১৫১
৪৫	উপসংহার	১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বীমার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

বীমা (Insurance) ঃ পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই অসংখ্য বিপ্লব সংগঠিত হয়ে আসছে। এ বিপ্লবের পেছনে কাজ করেছে মানুষের পর্যায়ক্রমে জীবন ধারনের মান উন্নয়নের মানসিকতা। এভাবেই শিল্প বিপ্লব বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের পাশাপাশি সামাজিক কাঠামোতেও পরিবর্তন আনয়ন করেছে। শিল্প বিপ্লব স্বনির্ভর অর্থনীতিকে করেছে পরস্পর নির্ভরশীল। বর্তমান পৃথিবীতে অর্থনীতিতে কেউ স্বনির্ভর নয়। অর্থনৈতিকভাবে পরস্পর নির্ভরশীল হওয়ায় জীবন ধারণে মানুষের ঝুকি বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের আনুপাতিক বৃদ্ধি সম্পদের স্বল্পতা, ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা এবং মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এ ঝুকিকে আরো বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। শিল্প বিপ্লবের পর সৃষ্ট ঝুকি বা অনিশ্চয়তা জন্ম হয়। এসব সমিতির মূল লক্ষ্য ছিল ঝুকির ভার লাঘব করা, এসব সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিই হল বীমা শিল্পের জন্ম।

বীমার সংজ্ঞা ঃ বীমা শব্দটি বাংলা, ইংরেজি হল Insurance. অভিধানে Insurance সম্পর্কে বলা হয়েছে- An Arrangement with a company in which to pay them regular amounts of money and they agree to pay the cost for example if you die or are ill or if your lose or damage.[১] বীমা এর অর্থ উপলব্ধি করা, বীমা হচ্ছে, কোন ক্ষতিকে বহুজনের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার একটি ব্যবস্থা।[২]

মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। একা চলার নীতি পথিবীতে কোন প্রাণীকূলের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয় না। ছাগল, গরু, মেষ এমনকি পিঁপিলিকা ও মৌমাছির মধ্যেও সমাজবদ্ধ জীবন ব্যবস্থার এক সুন্দর উদাহরণ লক্ষ্য করা যায়। এ দলবদ্ধতার মূল কারণ হল একের দুঃখে অন্যে দুঃখী একের বিপদে অন্যজন নিজেকে বিপদগ্রস্থ মনে করা এবং শত্রুর মোকাবেলা করা। মানুষ স্বভাবতই মানুষের সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা গড়ে তুলতে চায় বিপদে অন্যের সাহায্য সহায়তা লাভের লক্ষ্যে এভাবেই গড়ে উঠে

---

১ Oxford Advanced learners Dictionary By A.S. Hornby Six Edition. P-975

২ বীমা বিক্রয়ে আনন্দ, আবুল বাশার আকন্দ।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ গোষ্ঠি। একের বিপদে সকলে সমষ্টিগতভাবে এগিয়ে আসলে তার অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির ভার লাঘব হয়। এ সহায়তার সম্মিলিত প্রচেষ্টার নামই হল বীমা।

সংসদ বাংলা অভিধান ঃ বাংলা অভিধানে বীমার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ক্রমিক চাঁদার বিনিময়ে নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হলে কিংবা তৎপূর্বে বীমাগ্রাহকের সম্পত্তি হানি বা মৃত্যু ঘটলে মোট টাকা পাইবার চুক্তিই হল বীমা।[৩]

Encycloрeolia Britannica-তে, বলা হয়েছে Insurance is a provision made by a group of persons, Each singly in denger of some loss the incidence of which can not be foreseen that when such loss shall occur to any of them, it shall be distributed over the whole group.[4] বীমা হল এমন একদল লোকের ব্যবস্থা যাদের প্রত্যেকেই একাকী কোন না কোন ক্ষতি বা বিপদের সম্মুখীন, যার পরিণতি পূর্ব থেকে অনুমীত নয়। তাদের উপর যখনি বিপদ ঘটেছে তখনই সে বিপদের ক্ষয়ক্ষতি পুরো দলের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়।

The new columbea Encyclopaidia তে বীমার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে The essence of the contract of Insurance called a policy is mutuality The amount of the premium is determined by the operation of the law of average as calculated by actuarise. Insurance is a device for indemnifying against loss. Re imbursment is made from a fund to which many individuals exposed to the same risks have eontributed certain specified amount called premiums, Payment for the loss a divided among many does not that heavily upon the actual loser.[5]

অর্থাৎ বীমা চুক্তি যাকে পলিসি বলা হয় এর মৌখিক প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে পারস্পরিকতা, একচুয়ারী গড় বিধির উপরে ভিত্তি করে প্রদেয় প্রিমিয়াম নির্ধারণ করণ। বীমা ক্ষতিপূরণ করার একটি পদ্ধতি একই ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে এমন অনেক ব্যক্তি

---

৩ সংসদ বাংলা অভিধান, শ্রী দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক ৪র্থ সংস্করণ, পৃ- ৬২৩

৪ Insurance and slamic law, Dr. Md. Musleh uddin 1982 Delhi, ইসলামী জীবন বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল ড: আই, ম. নেছার উদ্দিন, পৃ- ২৮।

৫ সাধারণ বীমা অ,আ,ক,খ এম,এ সামাদ, পৃ- ১

Dhaka University Institutional Repository

প্রিমিয়াম আকারে একটি অংক পরিশোধ করে একটি তহবিল গঠন করে যা থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করা হয়। ক্ষতিপূরণের অর্থ বহুজনের মধ্যে বিভক্ত হওয়াতে তা একক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির উপর বোঝায় পরিণত হয় না।

শ্রী আগরওয়াল বলেছেন- বীমা একটা যৌথ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঝুঁকি সংশ্লিষ্ট লোক সমূহের মধ্যে বন্টন করে দেয়া যেতে পারে।

- অধ্যাপক মগান এর ভাষায় কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি লোকের কল্যাণ সাধনের সম্মাতিই হলো বীমা।
- অধ্যাপক মিত্রের মতে, কোন নির্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হলে এবং ঐ ঘটনা সংঘটিত হবার ফলে বীমা গ্রহীতার কোন ক্ষতি হলে নির্দিষ্ট টাকার অর্থ বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের শর্তে বীমা গ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকেই বীমা বলা হয়।
- হাদীসের বাণী তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও, এ বাণীর ভিত্তিতে জনগোষ্ঠীর সংঘটিত ক্ষতিতে পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ করার ব্যবস্থাকে বীমা বলে।

<u>আরবী ভাষার দৃষ্টিকোণ থেকে বীমা</u> ঃ বীমা শব্দের হুবহু অর্থে আরবি অভিধানে কোন শব্দ না থাকলেও এর কাছাকাছি অর্থ বুঝায় এমন কয়েকটি শব্দ আরবি ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। যেমন- تـــأمين (তামিন) অর্থ বীমা।[৬] تعاون (তাউন) যার অর্থ- اعان بعضـــهم بعضـــا (একে অপরকে পরস্পর সাহায্য করা)।[৭] عاقلـــة (আকিলা) কেহ অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করিলে ইসলামী আইন অনুযায়ী তাহার যে সকল পুরুষ আত্মীয়কে হত্যাকারীর পক্ষ হতে রক্তমূল্য (আকল) দিতে হয়। তাহাদিগকে সমষ্টিগতভাবে আকিলা বলা হয়।[৮] عاقلة (AQILAH) The relatives who pay the expiatory mulct for man slaughter, or any other legal fine.[৯]

---

৬ القاموس الوجيز لدارس العربية العزيز ড. মোঃ ফজলুর রহমান, পৃঃ ৩৯০।

৭ المنجد صفحة ٥٣٩

৮ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্ব কোষ ১ম খন্ড ২য় সংস্করণ, ইসলামী ফাউন্ডেশন, পৃ- ৭

৯ Dictrionary of Islam by thomas patrick Hughes, P- 16.

Dhaka University Institutional Repository

تكافل (তাকাফুল) যার অর্থ- تكافل القوم : كفل بعضهم بعضا (কাওমের সকলে পরস্পর জামিনদার হল।)[১০] Bail Arabic كفالة (Kafalah) : Bail is of two desicription; Kafalah Bin nafs or Kafalah bil mal or recurity for person or security for property.[11]

আরবী ভাষায় তাকাফুল শব্দটি বীমা এর অধিক কাছাকাছি, তাই ইসলামী চিন্তবিদগণ তাকাফুলকেই বীমা হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

মালয়েশিয়া তাকাফুল Act 1984 তে তাকাফুলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

Takaful means a scheme based on brotherhood, solidarity and mutual assistance, which provides for mutual financial aid and assistance to the participants in case of need whereby the participants mutually agree to contribute for that purpose. তাকাফুল মানে হচ্ছে, এটা এমন একটি প্রকল্প ব্যবস্থা যা ভ্রাতৃত্ব সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিচালিত, যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করে, যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ ধরনের আর্থিক সহায়তার জন্য সম্মত থাকে।[১২]

ইসলামী অর্থনীতিবিদগণের সংজ্ঞাগুলোও প্রায় এর কাছাকাছি। যেমন বলা হয়েছে Takaful means to take care of ones needs under takaful scheme the Member or the participants in a group agree to jointly guarantee themselves against loss or damage counsel by specified perils.[13]

ফলে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা ইতিহাস থেকে ইসলামী বীমা ব্যবস্থার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। তাকাফুল মানে হচ্ছে, একজনের প্রয়োজনে অন্যজন শরীক হওয়া। তাকাফুল স্কীমের অধীনে এর সদস্যগণ কিংবা অংশগ্রহণকারীগণ দলবদ্ধভাবে এ কথায় সম্মত হন যে, তাদের নিজেদের যে কোন নির্দিষ্ট দুর্বিপাকে বা দুর্ঘটনায় লোকগণ ক্ষতির বিপরীতে বিপদ লাঘবের জন্য চুক্তিবদ্ধ।

---

১০ المنجد صـ ٦٩١

১১ Dictrionary of Islam by thomas patrick Hughes, P- 34.

১২ তাকাফুল এক্ট মালয়েশিয়া ১৯৮৪

১৩ কে, এম মুরতাজা আলী, প্রবন্ধ ২০০২

Dhaka University Institutional Repository

বীমার সূচনা ও ক্রমবিকাশ

মানুষ পৃথিবীতে অর্থ নৈতিক জীবন ধারার মধ্যে বাস করে । অতি প্রাচিন যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রতিযুগেই মানুষ ক্রমান্বয়ে উন্নতি থেকে উন্নতিতর জীবন যাপন করে আসছে। মানব জীবনের অর্থনৈতিক দিকের একটি ক্ষেত্রে হল বীমা। অতি প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ বীমা ভিত্তিক জীবন যাপন করে আসছে। তবে সে পদ্ধতি গুলো ছিল অনুন্নত। তাই আমরা বীমার সূচনাকে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করব।

প্রথম পর্যায় ঃ Clayton দাবি করেন যে, বীমার প্রাথমিক ধারণা ব্যবীলিয়ন সভ্যতা থেকে শুরু হয়। আর তা ছিল খৃঃ পূর্ব ৩০০০ অব্দ[১], তার পর ব্যবীলিয়ন রাজা কর্তৃক সম্ভাবতঃ খৃ. পৃ. ২২৫০অব্দে Hammurabi নামে একটি সংস্থা (Code) গঠন হয়।[২] - তৎকালীন ব্যাবলীয়নরা যেখান থেকে টাকা ধার নিয়ে নির্দিষ্ট একটি লভ্যাংশ সহ পরিশোধ করতে হত। তার পর তা Bottomary ব্যবস্থাপনাতে রূপান্তরিত হয়। এ Bottomary ব্যবস্থাপনা খৃ. পূর্ব ৪০০০- ৩০০০ অব্দ এর মধ্যে ব্যাবেলীয়নদের দ্বারাই পরিচিতি লাভ করে। তখনকার যুগে মানুষ একজন অপর জন থেকে লোন নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করত এবং নির্দিষ্ট লভ্যাংশ সহ তা পরিশোধ করতে হত। অথবা তারা শেয়ার ব্যবসা করত এবং ব্যবসার অংশ ভাগ করে নিত। লোন দানকারী এবং গ্রহণকারী মধ্যে লভ্যাংশ প্রদানের শর্তে চুক্তি হত, লোন দানকারী লোন গ্রহণকরীর লাভ -ক্ষতিতে অংশিদার হত। তৎকালীন Bottomary পদ্ধতিতে Payment বা পরিশোধিত কিস্তি দেয়ার ভিত্তিই হল আজকে Premium (প্রিমিয়াম)। তখনকার ধারদান কারী আজকের বীমা গ্রহণকারী এবং তখনকার ধার গ্রহণ কারী আজকে বীমাকারী হিসেবে বিবেচনা করা যায়।[৩]

যতদুর জানাযায়, খৃ. পূর্ব ৪০০০ অব্দে বটমাবী বন্ড এবং রেসপন্ডেন্সিয়া বন্ড (Respondentia Bond) নামে দুটি ঋণ পদ্ধতির মাধ্যমে বীমা ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। এ

---

১ Clayton G. British Insurancees 1971, P. 13/ Insurance with A Comparative analysis between common Law and Islamic legal thought. Dr. Masum Billah P. 7,

২ Clayton G. British Insurance 1971, P. 13.

৩ Colen Athur "Notes on Insurance law".

Dhaka University Institutional Repository

দুটি বন্ড নৌপথের জন্যে চালু ছিল। মালামাল ক্ষতি সাধিত হলে ঋণ পরিশোধ করা হবে না আর ক্ষতিগ্রস্থ নাহলে ঐ ঋণ পরশোধ যোগ্য এর নাম দেয়া হয়েছে Bottonary Bond একই শর্তে জাহাজের জন্য চালু করা হয় Respondentia Bond. খৃ.পূ.৯১৬ অব্দে এ ধরণের ব্যবস্থার মাধ্যমে ইটালিয়ান ও রোচ দ্বীপের অধিবাসিগণ তাদের ব্যবসায়ী সামগ্রীর ক্ষতি থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করত[৪]।

ব্যবেলীয়নদের Bottomary পদ্ধতি পরবর্তীতে পয়োনেশিয়োনদের দ্বারা আরো উন্নতি লাভ করে খৃ. পূর্ব ১৬০০- ১০০০ অব্দে। তার পর গ্রীকরা সম্ভাবতঃ খৃ. পূর্ব ৪০০ অব্দে এ পদ্ধতি গ্রহণ করে থাকে।

খৃ. পূর্ব ৬০০ ব্যবেলীয়নরা Bottomary পদ্ধতিতে ভারতের সাথে ব্যবসা- বাণিজ্য পরিচালনা করত[৫]। গ্রীকদের উত্তরাধিকারী রুমীয়রা Bottomary পদ্ধতির আরো উন্নতি সাধন করে। ধার গ্রহণকারী অনাকাংখিত কোন বিপদে পড়ে ক্ষতি সম্মুখিন হলে ধার প্রদানকারীর দায় থেকে সে মুক্তিপেত। কেউ কেউ মনে করেন রুমীয়দের প্রণীত নিয়ম পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই বর্তমান যুগের ইন্সিউরেন্সের প্রচলন। রুমীয় পদ্ধতিতে ধার গ্রহণকারী অনাকাংখিত কোন বিপদ দ্বারা ক্ষতি গ্রস্ত হলে সে দায়ভার থেকে অব্যাহতি পেত। আজকের ইন্সিউরেন্স গ্রহণকারী নিঁখাদ ঝুকির দ্বারা ক্ষতি গ্রস্ত হলে তাকে পূর্ণ ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করবে ইন্সিউরেন্স কোম্পানী এবং সে Premium (প্রিমিয়াম) প্রদানের দায়ভার থেকে অব্যহতি পাবে।

Tremerry লিখেছেন আজকের যে সব উপাদন এবং শর্তে বীমা হয়ে থাকে তা Bottomary পদ্ধতিতে ও রুমীয়রা অনুস্বরণ করত। ১৪ থেকে ১৫ শতাব্দিতে ইটালীতে নৌবীমার প্রচলন হয়।[৬]

স্যার থমাস গ্রেসহাম সর্বপ্রথম রয়েল এক্সেঞ্জ স্থাপন করেন ২৩ শে জুলাই ১৫৭০ খৃ.। কুইন এলিজাবেথ -১ - রয়েল এক্সেঞ্জকে অফিস হিসাবে ব্যবহার করেন।[৭]

---

৪ ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্ম কৌশল ড. আর. ই. ম. নেছার উদ্দিন, পৃঃ ১৪

৫ The new Ency clopedia Britanica, P 690

৬ Smurth Waite, Ronald Insurance the Sunday time, London 1960, P-11.

Dhaka University Institutional Repository

এ রয়েল এক্সেঞ্জকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীতে লন্ডন আন্তর্জাতিক বীমার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়।

১৩ এবং ১৪ শতকে ইটালীর ব্যবসায়ীগণ লন্ডনে বসতি গড়ে তোলে এবং ইংল্যান্ডে আধুনিক নৌবীমা গড়ে তুলে। প্রথম নৌ বীমা নেয়া হয়েছিল ১৩৪৭ সালে ভূমধ্যসাগরের এক সমুদ্র যাত্রায়[৮]। বীমা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি সহজ ছিল না বিধায় নৌবীমা পলিসি রেজিষ্ট্রি করার জন্যে ১৫৭৫ সালে চেম্বার অব এ্যাসিউরেন্স নামে একটি অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৬০১ সালে নৌবীমা সংক্রান্ত একটি শালিসী আদালত স্থাপিত হয়। এ ভাবেই ইংল্যান্ডে নৌবীমার গোড়াপত্তন হয়।[৯] জীবন বীমার ব্যপক প্রচলন হলেও মূলত সর্বপ্রথম নৌ বীমা দিয়েই বীমার প্রচলন।

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে লন্ডন শহরের কফি হাউজ গুলো ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রবিন্দু। এ হাউজ গুলোতে নিলামে জাহাজ বিক্রির মত বড় বড় চুক্তি সম্পাদন করা হত। পণ্যের বা জাহাজের ঝুকির ওপর বীমা পলিসি দেয়া হত। সেখানে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বীমা পলিসি দেয়া হত না। নৌ ঝুকির বিপরীতে ক্ষতি পূরণের অঙ্গিকার করতেন এক বা একাধিক ব্যক্তিবর্গ যারা নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রিমিয়ামের বিনিময়ে পণ্য ও জাহাজের মালিককে নির্দিষ্ট ঝুকির বিপরীতে ক্ষতিপুরণের অঙ্গিকার করতো, তাদেরকে বলা হত Under writer বা বীমাকারী । পলিসি পত্রের নিচে এরা স্বাক্ষর করতেন বলে এদেরকে বলা হত Under writer। ১৬৮০ সালে এডওয়ার্ডলয়েড লন্ডন বন্দরের কাছে এক কফি হাউস খোলেন। তখন বন্দরের কাছাকাছি কফি হাউজ গুলোতে ছিল বণিকদের আড্ডা খানা। কোন জাহাজ কোথায় যাবে, সময় সূচি কি ইত্যাদি মোট কথা জাহাজ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয় নিয়ে বিভিন্ন কফি হাউজে বণিকদের মধ্যে আলোচনা হত। লয়েডস এর কফি হাউজ ছিল সব চেয়ে বড় ও প্রধান আলোচনার স্থান। মিঃ লয়েড দেশ- বিদেশের জাহাজের খবরা খবর নাবিকদেরকে দিতেন।

---

৭ Raynese E. Harold Insurance, Oxford University plass London - 1960, P. 1. Insurance with A comparative analysis Between common Law and Islamic Legal thought, 1997, P. 10, Dr. Masum Billah

৮ সাধারণ বীমা আ. অ. ক. খ. এম. এ সামাদ পৃঃ ১০

৯ ইসলামী জীবন বীমা, কাজী মুর্তুজা আলী পৃঃ ১৬

Dhaka University Institutional Repository

সাংকেতিক ইংগিতের মাধ্যমে জাহাজের গতি বিধিসংগ্রহ করতেন। ১৭১৩ সালে মিঃ লয়েডস মারা যান। ১৭৩৪ সালে লয়েডস এর কফি হাউজ থেকেই প্রকোশিত হয় ইংলেন্ডের ২য় প্রাচিনতম সংবাদত্র " লয়েড লিষ্ট" যা আজ ও নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়।[১০] ক্রমে ক্রমে দেখা গেল মিঃ লয়েডস এর কফিখানা নৌ বীমার দায় গ্রাহকদের কার্যক্রমের কেন্দস্থল হয়ে উঠল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭২০ সালে The liodis Assirance & the Royal Exchance নামে দু'টি বীমা কোম্পনী প্রতিষ্ঠীত হয়[১১]। ১৭৭১ সালে দায় গ্রহক এবং ব্রোকাররা মিলে " লয়েডস এর দায় গ্রাহক সমিতি" নামে সংগঠন গঠন করেন। এটাই পৃথিবীর সর্বপ্রথম নৌবীমা কোম্পানী।[১২] বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় ও জনপ্রিয় ইন্সিউরেন্স কোং ১৬৮৮ সালে জেমস এর সময় ইংল্যান্ডের এক কপি হাউজ থেকে যার সূচনা হয়।[১৩]

জীবন বীমা ঃ নৌ ও অগ্নি বীমার সাথে সাথে জীবন বীমার নানা শাখার প্রচলন ১৩শ শতাব্দী থেকে শুরু হয়, অবশ্যই তখন মাত্র সামায়িক বীমা (Short term) নামে চালু ছিল। ১৩১০ সালে বেলজিয়াম সরকার কর্তৃক প্রথম জীবন বীমা কোম্পানী অনুমোদ লাভ করে। ১৫৭৪ সালে ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথ সকল ধরণের বীমা পলিসিকে তালিকাভূক্ত করার ক্ষমতা দান করেন।

১৫৮৩ সালে বৃটিশ যাদুঘরে রক্ষিত প্রাচীনতম যে জীবন বীমা চুক্তির প্রমাণ্য নিদর্শন দেখা যায় তা হচ্ছে একটি সাময়িক জীবন বীমার চুক্তি। ১৮ই জুন- ১৫৮৩ সালে প্রথম অফিসিয়াল রীতি মাফিক জীবন বীমার পলিসি বিলি করা হয়। উইলিয়াম গীবন নামে লবণ ব্যবসীর জীবনের উপর প্রথম পলিসি ইস্যু কর হয়। পলিসির মেয়াদ ছিল ১২ মাস।[১৪] মিঃ গীবন যদি ঐ বছর মারা যান তা হলে তার উত্তরাধীকারীকে ৩৮৩ পাউন্ড ৬ শিলিং - ৮ পেন্স দেয়া হবে। বীমা চুক্তির অংক ছিল ৩৮৩ পাউন্ড ৬ শিলিং ৮ পেন্স এবং প্রিমিয়াম ছিল ৩২ পাউন্ড পরবর্তী বছর ২৮ শে মে ১৫৮৩ সালে মোট ৩৪৫ দিনের মাথায় মি. গীবন মারা যান।

---

১০ ইসলামী জীবন বীমা, কাজী মুর্তুজা আলী পৃ: ১৬

১১ ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্ম কৌশল, ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন, পৃ: ১৪,

১২ সাধারণ বীমা অ. আ. ক. খ. এম. এ. সামাদ পৃ: ১১

১৩ The world Book of Encyclopadia P. 344

১৪ Life Insurance in Malaysia, Life Insurance association of Malaysia, kualalumpur, 1985, P. 1 ইসলামী জীবন বীমা, কাজী মুর্তুজা আলী পৃ: ১৬

Dhaka University Institutional Repository

বীমা কারীগণ দাবি পরিশোধ করতে অস্বীকার করেন এবং বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। বীমাকারীদের যুক্তি যে, পলিসি মেয়াদ ১২ মাসের জন্যে নির্ধারিত ছিল এবং তারা চন্দ্র মাস ২৮ দিন হিসেবে নির্ধারিত করেছিল এবং তা ছিল ৩৩৬ দিন। মি. গীবন চন্দ্র মাস হিসেবে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে মৃত্যু বরণ করেনি। সুতরাং দাবি পরিশোধ যোগ্যনয়। পরবর্তীতে আদালত এ যুক্তি অগ্রাহ্য করলে বীমা কারীগণ দাবী পরিশোধ করতে বাধ্য হন। ১৬৯৩ সালে রয়েল সোসাইটি জ্যোতির্বিদ এ্যাড মুন্ডহ্যালি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মৃত্যুহার পঞ্জি সর্ব প্রথম প্রকাশ করে. যা হ্যানির মৃত্যু পঞ্জি নামে পরিচিত।[১৫]

জীবন বীমার অফিস The Handin Hand society স্থাপিত হয় ১৬৯৬ সনে ইংল্যান্ডে। এর সদস সংখ্যা ১০০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর প্রতিষ্ঠিত হয় দু'হাজার সদস্য সমন্বিত বিধবা ও অনাথদের সমিতি The society of wedow and orphanes. এ সমিতির মাথা পিছু ফি ছিল পাঁচ শিলিং এবং কোন সদস্যের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ ছিল ৫০০ পাউন্ড।[১৬]

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ ইংল্যান্ডেই প্রথম সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি মাধ্যমে বীমা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭০৬ সালে Amicable society for perpetual assurance গঠন করেন হাটলে নামক লন্ডনের এক পুস্তক ব্যবসায়ী[১৭]। জীবন বীমার ইতিহাসে এটাই প্রথম সুনির্দিষ্ট ও সমবায়ী বীমা প্রতিষ্ঠান। এ সমিতি সল্প পরিমাণে মৃত্যু দাবি পরিশোধ করত। ২০০০ লোকের ঝুকিবহণ করত এ প্রতিষ্ঠান বীমা ঝুকির পরিমাণ ছিল ৬ পাউন্ড ৪ শিলিং। বয়স সীমা ছিল ৪৫ বছরের নীচে। এ্যামিকেবল সোসাইটি নরউইচ বীমা কোম্পানীর অংশ হিসেবে এখনো টিকে আছে।[১৮]

James Dodsen একজন স্কুল শিক্ষক ও গণিত বিদ ছিলেন।তার বয়স ৪৫ বছরের উপরে ছিল বলে Amicable society তে বীমা করতে পারেন নি। এ থেকে তিনি এবং অন্যান্য সহযোগীদেরকে নিয়ে প্রিমিয়াম এর একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিস্কার করেন। এ বিজ্ঞান এক চ্যয়ারিয়েল বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত। এ বিজ্ঞানের সাহায্যে পরবর্তী কালে যে

---

১৫ বীমা বিক্রয়ে আনন্দ, আবুল বাশার আকন্দ, পৃ. ১৩
১৬ অন্যান্য পেশা জীবন বীমা, মোঃ সিরাজুল ইসলাম পৃ: ২৩
১৭ অন্যান্য পেশা জীবন বীমা, মোঃ সিরাজুল ইসলাম পৃ: ২৩
১৮ বীমা বিক্রয়ে আনন্দ, আবুল বাশার আকন্দ, পৃ: ১৪

Dhaka University Institutional Repository

কোন বয়সের লোকের বীমা করানো সম্ভব হয়েছে। এতে বীমা জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। Old Amicable Society ১৭০৬ সালে ইংল্যান্ডের রাণী কর্তৃক প্রদত্ত রাজকীয় চার্টাবের বলে জীবন বীমা ব্যবসা শুরু করে। সোসাইটির সদস্যরা নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম প্রদান করত। ইংল্যান্ড ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ সময় জীবন বীমা ব্যবসা ক্রমশ বিস্তার লাভ করে।[১৯]

১৭২০ সালে The leoyds Assurance & The Royal Exchancge নামে দু'টি কোম্পানী গঠিত হয়। এ বীমা কোম্পানী দুটি অন্যান্য বীমা ব্যবসার সাথে নৌবীমার ও ব্যবসা করত।[২০] মৃত্যুর হার বিষয়ক স্বরণী Mortality table উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবন বীমা ক্রমশঃ সঠিক বিজ্ঞান ভিত্তিক চরিত্র অর্জন করে। ইংল্যান্ডে The society for the Equitable assurance on lives & survivers ship গঠিত হয় ১৭৬২ সালে। সে সময় থেকেই মৃত্যু ছাড়াও জীবন বীমার অন্যান্য ক্ষেত্রে সফলতা পরিলক্ষিত হয়।[২১] আমেরিকাতে সর্বপ্রথম বীমা কোম্পানী The philadelphia contribution ship ব্যাঞ্জমিন ফ্রাংকলিন কর্তৃক ১৭৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২]

১৭৭৪ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে Gambling Act পাশ করা হয়।[২৩] এ আইন পাশের পরেই বীমা যোগ্য স্বার্থ ব্যতিরেকে বীমা বিক্রয় বে আইনী ঘোষণা করা হয়। এ আইনে জীবন বীমাকে বাজী খেলা বলে অভিহিত করে তা বন্ধ করে দেয়া হয়।[২৪] কারণ জীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমা যোগ্য স্বার্থ ছাড়াই পলিসি বিক্রয় করা যেত যেমন বিচারাধীন আসামীর জীবনের উপর যে কেউ করতে পারত এবং আসামীর ফাসী হলে বীমা গ্রহণ কারী ব্যক্তি বীমার টাকা পেয়ে যেতেন।

১৭৮৭ সালে জীবন বীমা অফিসিয়াল রীতি মাফিক ফ্রান্সে ব্যবসা শুরু করে। ১৭৯২ সালে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০০ সালে হতে গ্রুপ বীমা ব্যবসা প্রবর্তীত

---

১৯ ইসলামী জীবন বীমা, কাজী মুর্তুজা আলী, পৃ: ১৬
২০ জীবন বীমার মৌলিক উপাদান, এ. কে. এম. ইলিয়াস হোসেন, পৃ: ১৬
২১ অন্যান্য পেশা জীবন বীমা, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পৃ: ২৪
২২ The new Encyclopaedia Britannica, P. 690
২৩ ইসলামী জীবন বীমা, কাজী মুর্তুজা আলী, পৃ: ১৬
২৪ বীমা বিক্রয়ে আনন্দ, আবুল বাশার আকন্দ, পৃ: ১৫

Dhaka University Institutional Repository

হয়।সাধারণতঃএকই পেশার সহকর্মী মৃত্যু বরণ করলে তাদের উত্তরাধীকারিদেরকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করত।

১৮০৬ সালে লন্ডন লাইফ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে The pennsylvania Company for Insurance and lives প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৩ সালে কানাডাতে বীমা ব্যবস্থা শুরু হয়। ১৮৪৭ সালে Canadian life Insurance কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। বীমা কোম্পানী Sun life Assurance company of Canad প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৪ সালে।[২৫]

১৬৬৬ সালে লন্ডন শহরে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ফলে ব্যপক ক্ষতি সাধন হয়। এর পর থেকেই অগ্নি বীমার প্রচলন হয়।[২৬] ১৬৮০ সালে প্রথাম প্রতিষ্ঠিত হয় The Fire office. বসত বাড়ীর পাশা পাশি পণ্য ও গৃহসামগ্রীর জনে অগ্নি বীমা প্রচলন হয় ১৭০৮ সালে। এসব বীমা কারীগণ আগুনের ক্ষয় ক্ষতি হতে বীমা গ্রহীতাদের সম্পদ রক্ষার জন্যে নিজস্ব ফায়ার ব্রিগেড ব্যবস্থা গড়ে তুলেন।[২৭] ১৮৬৬ সালে ইংল্যান্ডের টলে স্ট্রীটের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের পর তখনকার প্রচলিত অগ্নিবীমা পলিসি বিজ্ঞান ভিত্তিক অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করে অগ্নবীমার শ্রেণী বিভাগ এবং নির্দিষ্ট প্রিমিয়াম পদ্ধতির প্রচলন করা হয়। ১৮৬৮ সালে Fire office committe করা হয়।[২৮] এর পরই প্রতিষ্ঠিত হয় Joint Fire Research organisation. উনিশ শতকের শেষ দিকে মোট গাড়ী আবিষ্কারের সাথে দূর্ঘটনা ও মোটর বীমার উদ্ভব ঘটে। এ সময় সিধেল চুরির ইনসিওরেন্সের ও প্রকাশ ঘটে। বিমান আবিষ্কারের সাথে Avication Insurance এর জন্ম হয়। ১৯৩০ সালে মোটর গাড়ীর দূর্ঘটনার ফলে তৃতীয় পক্ষের সম্পদ ও জীবনের ক্ষয় ক্ষতি জনিত দায় নিরসন কল্পে Third party liability Insurance বাধ্যতা মূলক করা হয়।[২৯]

---

২২ বীমা বিক্রয়ে আনন্দ, আবুল বাশার আকন্দ, পৃ: ১৫

২৬ The thesis Insurance with a comparetive analysis between common law and Islamic legal though 1998 P. 10

২৭ ইসলামী জীবন বীমা, কাজী মুর্তুজা আলী পৃ: ১৬

২৮ সাধারণ বীমা এম. এ. সামাদ পৃ: ৫১

২৯ ইসলামী জীবন বীমা, কাজী মুর্তুজা আলী, পৃ: ১৭

Dhaka University Institutional Repository

ভরতীয় উপমহাদেশে বীমা

নৌ বীমার মাধ্যমে বীমার সূত্রপাত হলে ও উপমহাদেশে জীবন বীমা দিয়েই বীমার শুরু হয়। আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর[৩০] আগে বৃটিশ ব্যবসায়ী ও খৃষ্টান মিশনারীদের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে জীবন বীমার সূত্রপাত হয়।

১৮১৮ সালে আধুনিক জীবন বীমার প্রতিষ্ঠান ওরিয়েন্টাল লাইফ ইন্সিউরেন্স। এটিই ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম জীবন বীমা। এর কয়েক বছর পর ১ লা মে ১৮২৩ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বোম্বে লাইফ ইনসিউরেন্স কোম্পানী। ১৮২৯ সালে মাদ্রাজে স্থাপিত হয় মাদ্রাজ ইকুইটেবল। ১৮৪৭ সালে " খ্রীষ্টান মিউচিয়াল" নামে আরো একটি জীবন বীমার সূত্রেপাত হয়[৩১] যুক্ত প্রদেশ মীরাটে। তার পর তা স্থানান্তরিত হয় লাহোরে। প্রথমত এ সব জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান ইউরোপীয় ও খ্রীষ্টনদের জীবন বীমা করত। কলকাতার অধিবাসী বাবু মুতিলালশীল এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পরবর্তীতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের জীবন বীমা গ্রহণ করা হতে থাকে। কিন্তু ভারতীয়দের ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম দিতে হত অধিক হারে। ভারতীয়দের বীমা প্রদান করা হত না প্রকাশ্য ভাবেই। ১৯০৬ সালে "দিমেইল" পত্রিকায় মাদ্রাজ ইকুইট্যাবল এ্যাসুরেন্স সোসাইটিজ এর বিজ্ঞাপনে পরিস্কার উল্লেখ ছিল The society does not insure the lives of Natives of India.

এ বাস্তবতা উপলব্দি করে ভারতীয়দের জন্যে প্রথম জীবন বীমা কোম্পানী গঠিত হয় ৩রা ডিসেম্বর ১৮৭০ সালে। প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল বোম্বে নিউচিয়াল লাইফ ইন্সিউরেন্স সোসাইটি যা বোম্বে মিউচিয়াল নামে পরিচিত । শুরুথেকেই বোম্বে মিউচিয়াল সতর্কতামূলক অধিক হারে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করে। সে সময়ে কিছু বীমা কোম্পনীর দেউলিয়াত্বের কারণে বীমার উপর মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলার উপক্রম, বোম্বে মিউচিয়াল প্রতিষ্ঠার পরপর জনগণের আস্থা অর্জনের লক্ষে " ওরিয়েন্টাল গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এ্যাসুরেন্স কোম্পানী" নামে একটি বীমা প্রতিষ্ঠান ১৮৭৪ সালে যাত্রা শুরু করে।

---

৩০ ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্ম কৌশল ড. আ. ই. ম. নেছার উদ্দিন পৃ: ১৬

৩১ বীমা বিক্রয়ে আনন্দ আবুল বাশার আকন্দ, পৃ: ১৬

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের কয়েক জন উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি বীমার সাথে যুক্ত ছিলেন। তারা হলেন জমিদার প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর রামতনু লাহিড়ী ও বিশিষ্ট শিল্পপতি রুস্তমজী কাওয়াসজী। এছাড়া হিন্দু ধর্মের সংস্কারবাদী নেতা রাজা মোহন রায়ের অবদান অনস্বীকার্য তিনি সতীদাহ প্রথা বহিত কারণ আন্দোলনের সাথে সাথে হিন্দু বিধবাদের আর্থিক স্বচ্ছল তার জন্যে জীবন বীমা অনুরূপ সংগঠন বা সমিতি গঠনে ভারতয়িদেরকে উৎসাহিত করেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু সমাজ বীমার প্রতি ঔদাসিন্য থাকলে ও পরবর্তীতে তারা জীবন বীমার দিকে অনেক ঝুকে পড়ে। তবুও খ্রিষ্টান মিশনারীরাই ছিল এর অগ্রপথিক । ১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠত হয় বেঙ্গল ক্রিস্টিয়ান ফ্যামিলি পেনশান ফান্ড। ১৮৭১ সালে বিশিষ্ট শিক্ষা বিদ ও সমাজ সংস্কারক পন্ডিত ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলকাতার প্রতিষ্ঠা করেন " হিন্দু ফ্যামিলি এ্যানুইটি ফান্ড"। ১৮৭৬ সাল থেকে হিন্দু বিধবাদের জন্যে কাজ করে মোম্বে উইডোজ এ্যান্ড পেনশন কান্ড।

প্রথম বীমা প্রতিষ্ঠান " ওরিয়েন্টাল লাইফ ইনসিওরেন্স" ১৮৫৩ সালে ইংল্যান্ডের" মেডিক্যাল ইনভ্যালিও এন্ড জেনারেল এর দ্বারা অধিকৃত হয়। আবার ১৮৬০ সালে " মেডিক্যাল ইনভ্যালিড এন্ড জেনারেল" এ্যালবার্ট কোম্পানীর সাথে একিভূত হয় এবং ১৮৬৯ সালে এলবার্ট দেউলিয়াত্বের শিকার হয়। এভাবে প্রথম ওরিয়েন্টাল বিলুপ্ত হয় এবং এর পরবর্তী বছর ই " ইউরোপীয়ান" নামে আরো একটি বৃটিশ কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যায়। অদক্ষ ব্যবস্থাপনা ও জালিয়াতির কারণে ইংল্যান্ডের দু'টি জীবন বীমা কোম্পানীর করুণ পরিণতিতে উপমাহদেশে জীবন বীমা প্রসারে সংকটাপন্ন হলে বৃটিশ পার্লামেন্টে সে বছরে পাস হয় " লাইফ ইনসিউরেন্স কোম্পানীজ এ্যাক্ট - ১৮৭০"।

১৮৭৪ সালে জন্ম লাভ করে ' ওরিয়েন্টাল গভার্নমেন্ট সিকিউরিটিজ লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লি:। দ্বিতীয় ওরিয়েন্টাল এর প্রতিষ্ঠাতাগণ ছিলেন ভারতীয় এবং ভারতীয়দের জন্যে কোনরূপ অতিরিক্ত প্রিমিয়াম ছাড়া তারা বীমা পলিসি বিক্রয় করে। "ওরিয়েন্টাল লাইফ" এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন কমরুদ্দিন তৈয়বজী নামে এক বিশিষ্ট মুসলিম আইনবিদ ও ব্যবসায়ী এবং বোম্বে শহরে তিনিই ছিলেন প্রথম এটর্নি। ১৮৯৭ সালে বোম্বে প্রতিষ্ঠিত "এমপায়ার অব ইন্ডিয়া" এর পরিচালক ছিলেন আরো একজন মুসলিম ধনশীল এম আব্দুল্যাহ ধরমসী। হাতেগণা কয়েক জন মুসলিম বীমার সাথে জড়িত থাকলে ও গোটা মুসলিম জাতি উপমহাদেশে বীমার ক্ষেত্রে ছিল অনগ্রসর।

Dhaka University Institutional Repository

বিংশ শতাব্দীতে বীমা

বিশ শতকে শুরু ভারতে শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। বিদেশী পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের অগ্রহ প্রবল থেকে প্রবলতর হতে থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভারতীয়দের দ্বারা একাধারে ব্যাংক, বীমা ও শিপিং কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে । ১৯০৬ সালে " ইউনাইটেড ইন্ডিয়া লাইফ এ্যাসুরেন্স কোম্পানী " মদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। একই বছর " ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স কোম্পানী" এবং " ন্যাশনাল ইন্ডিয়া ইনসিওরেন্স কোম্পানী" নামে দু'টি জীবন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৯০৭ সালে কোলকাতার " মহর্ষী ভবনের " একটি কক্ষে জন্ম লাভ করে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিউরেন্স সোসাইটি, মহর্ষী ভবন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এর বাস ভবন হিসেবে পরিচিতি ছিল। ১৯৩৪সালে হিন্দু স্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিউরেন্স সোসাইটির সিলভার জুবিলি (রৌপ্য জয়ন্তী) অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ এ প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রাকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। হিন্দুস্তান কো- অপারেটিভ সোসাইটির প্রদান উদ্যোগী ছিলেন ঠাকুর পরিবারের কৃতি সন্তান শ্রী নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯১৯ সালে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ কোম্পানীতে কোরানী হিসেবে চাকুরীতে যোগ দিয়েছেন ময়মনসিংহের অধিবাসী নলিনী রঞ্জন সরকার। অভাবের কারণে প্রবেশিকা পাশকরার পর আর লেখাপড়া করতে পারেননি। নিজ প্রতিভা বলে ১৯৩২ সালে তিনি এ প্রতিষ্ঠানরে জেনারেল ম্যানেজার ও পরে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। শেরে বাংলা এ.কে. এম ফজলুল হকের মন্ত্রি সভায় তিনি মন্ত্রি হিসেবে যোগদানের করেন। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ১৯২৩ সালে আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ভারত বিভাগেরপর পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রি নিযুক্ত হন। তিনি কোলকাতার মেয়র নির্বাচিত হন এবং "ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ড্রাষ্টির সভাপতি" নির্বাচিত হন।

উপমাহদেশে আরেকজন স্বনাম ধন্য ব্যক্তি হলেন স্যার ফিরোজ সেথনা ১৯০১ সালে তিনি " সান লাইফ অব কানাডা" এর বীমা বিক্রয় কর্মী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে বিশ্বের এ বৃহৎ বীমা কোম্পানীর শীর্ষ স্থানে নিজেকে পৌছাতে পেরেছেন। তিনি ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন। ইংরেজ সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

সাথে গোলটেবিল বৈঠকে স্যার ফিরোজ সেথানার অংশ গ্রহণ ছিল যথেষ্ট তাৎপর্য পূর্ণ। উপমহা দেশে বীমার ইতিহাসে উল্লেখ যোগ্য ঘটনা হল ১৯১২ সালে " বীমা আইন" বলবৎ বা ইন্ডিয়ান লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানীজ এ্যাক্ট ১৯১২"। এ আইন প্রবর্তনের ফলে ১২০০ টি প্রভিডেন্ট সোসাইটি থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যেই এর সংখ্যা ৯০ তে নেমে আসে। ১৯১৩ সালে বীমা বিধিপ্রণীত হয়। ১৯১৩ সাল থেকেই রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা বীমা ব্যবসা পরিচালিত হতে থাকে,১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় বীমা তথ্য সম্বিলিত ইয়ার বুক। ১৯২৮ সালে ভারতীয় বীমা কারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে গঠিত হয় " ইন্ডিয়ান ইনসিউরেন্স অফিসার্স এ্যাসোসিয়েশন" ও " ইন্ডিয়ান লাইফ ইন্সিউরেন্স এ্যাসোসিয়েশন", আবার ১৯৮২ সালেই " ইন্ডিয়ান ইন্সিউরেন্স কোম্পানীজ এ্যাক্ট পাশ হয়। এ আইনের ফলে বীমা ব্যবসার উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে বীমা কোম্পানীর উপর বাধ্য বাধকতা আরোপ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব যুদ্ধ ও বীমা

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে ভারত বর্ষের ব্যাংক ব্যবসাতে বড় ধরণের ধ্বংস নামে এবং এর প্রভাব বীমা ব্যবসার উপরও পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর জীবন বীমা ব্যবসায় নতুন প্রাণ পায়। ১৯১৯ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে ভারতে ৩৯টি নতুন জীবন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১৮১৮- ১৯১৮) শত বছর ধরে ভারত বর্ষে বীমা ব্যবসা চালু থাকলে ও মুসলিমদের মধ্যে জীবন বীমা গ্রহণ করার তেমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এর পিছনে ধর্মীয় বাধ্য বাধকতাই অনেকটা কাজ করেছিল। ১৯০৬ সালে মুসলিমলীগ গঠনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক দুর অগ্রসর হলেও জীবন বীমার প্রতি তেমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় নাই। ১৯৩২ সালে মরহুম আঃ রহমান ছিদ্দিকীর নেতৃত্বে কলকাতায় মুসলমানদের পরিচালনাধীন প্রথম বীমা কোম্পানী " দি ইষ্টার্ণ ফেডারেল ইউনিয়ন ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লিমিটেড" প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৫ সালে লাহোরে কবি ইকবালের নেতৃত্বে "দি মুসলিম ইন্ডিয়া ইন্সিউরেন্সে কোম্পানী লিঃ" স্থাপিত হয়। পাকিস্তানে স্বপ্নদ্রষ্টা ডঃ ইকবাল ও জনাব ছিদ্দিকী দু'টি বীমা কোম্পানী গঠন করে সর্ব প্রথম মুসলমানদেরকে বীমা শিল্পে উদ্বুদ্ধ করেন।[৩২]

১৯৩৮ সালে নতুন বীমা আইন " ইন্সিউরেন্স এ্যাক্ট" প্রবর্তন করা হয়। এসময় ভারতের মোট বীমার সংখ্যাছিল ৩৬৪টি । তম্মধ্যে ২১৭ টি ভারতীয় এবং ১৪৭ টি বিদেশী কোম্পনী ভারতে বীমা ব্যবসা করে যাচ্ছে। মোট বিক্রিত জীবন বীমা পলিসির সংখ্যা ছিল ১৫ লাখের ও অধিক।এছাড়া ৫০০শ থেকে ও বেশী প্রভিডেন্ট সোসাইটি ভারত বর্ষে চালু ছিল।

১৯৪১ সালে করাচিতে প্রতিষ্ঠিত হয় " ইস্টর্ণ লাইফ", ১৯৪২ সালে মুসলিম ব্যবসায়ীদের দ্বারা বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হয় " তাবিব ইন্সিউরেন্স কোং লিঃ"। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জয় ভারত' , নিউ গ্রেট, ও পৃথ্বী।

১৯৩৮থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বীমা ব্যবসা কিছুটা কমে গেলে ও ১৯৪৩ সাল থেকে তা আবার ক্রমশঃ বৃদ্ধিপেতে থাকে। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ শাসনের অবসান হলে ভারত ও পাকিস্তানে নামক দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

---

[৩২] অন্যান্য পেশা জীবন বীমা, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

উপমহাদেশে বীমার পথিকৃৎগণ

এ উপমহাদেশে বীমা শিল্পের প্রতি জন গণের ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি। হিন্দুদের পারিবারিক প্রথার মাধ্যমে এক ধরণের আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা থাকাতে প্রাথমিক পর্যায়ে বীমার প্রতি তারা আগ্রহী হয় নাই। ধর্মীয় দৃষ্টি কোন থেকে বীমা গ্রহণ যোগ্য নয় এ মনোভাব মুসলমানদের মধ্যে প্রবল ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রতিকূল মনোভাবকে পরিবর্তন করে বীমাকে জনকল্যাণ মূলক রূপে রূপায়িত করতে অনেক জ্ঞানী ও গুণী জনের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

সমাজ সংস্কারক রাজা রাম মোহন রায় ঃ সতীদাহপ্রথা বিলুপ্তিতে তার বলিষ্ঠ ভূমিকাকে আজ ও হিন্দু নারী গণ শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করে। বীমা বিকাশেও তার অবদান শ্রদ্ধার দাবি রাখে। হিন্দু বিধবাদের আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়টি তাকে ভাবিয়ে তুলে। আর তিনি এ থেকেই জীবন বীমার প্রয়োজনীতাকে অনুভব করেন। ১৮২১ সালে "সংবাদ কৌমুদী" পত্রিকা মারফৎ তিনি ধনীদের প্রতি আহ্বান জানান যে, তারা যেন হিন্দু বিধবাদের জীবন বীমা ব্যবস্থা প্রচলনের দিকে এগিয়ে আসেন।

কমরুদ্দিন তৈয়বজী ঃ কামরুদ্দিন তৈয়বজী বীমার ইতিহাসে একজন সফল ব্যক্তিত্ব। প্রথম ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠিত জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান " ওরিয়েন্টাল" এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন কামরুদ্দিন তৈয়বজী। তিনি ইংল্যান্ডে আইন বিষয়ে পড়াশুনা করে বোম্বে আইন পেশায় আত্ম নিয়োগ করেন। মুসলমানদের বেলায় তিনি প্রথম আইন পেশায় যোগদান করেন। ১৮৬৩ সালে ২৭ বছরে তিনি Justice of peace হিসেবে সম্মানিত হন। ১৮৭৪ সালে ওরিয়েন্টাল ইন্সিউরেন্সের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান থাকা কালেই ১৮৮৯ সালে মৃত্যু বরণ করেন।

প্রিন্স দ্বার কানাথ ঠাকুর ঃ তিনি একাধারে ছিলেন জমিদার ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি ব্যাংক ও বীমা ব্যবসায়ের গুরুত্ব যথেষ্ট অনুভব কারন। বৃটিশদের দ্বারা পরিচালিত Laudable society নামক প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ছিলেন। Laudable Society ছিল তৎকালী সামরিক ও বেসামরিক বৃটিশ কর্মচারী ও বিধবাদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্যে প্রতিষ্ঠিত। বীমা ব্যবসার অগ্রপথিকদের মধ্যে প্রিন্স দ্বার কানাথ ঠাকুর ছিলেন অন্যতম।

Dhaka University Institutional Repository

রুস্তমজী কাওয়াজী ঃ বোম্বের অধিবাসী হলে ও রুস্তমজী কাওয়াজী ১৮২১ সালে কোলকাতায় ব্যবসা করতেন।১৮২৮ সালে তিনি অংশীদারের ভিত্তিতে বৃটিশদের সাথে বীমা ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ও Laudable Society এর সাথে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ছয়টি বীমা কোম্পানীতে বিনিয়োগ করেন। তম্মধ্যে অন্যতম হল, সান লাইফ, নিউ ওরিয়েন্টাল, ইউনিভার্সাল লাইফ। তিনি একমাত্র ভারতীয় হিসেবে ইউনিয়ন কোম্পনীতে বিনিয়োগ করেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ ঃ ভারতীয় মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদুত ছিলেন স্যার সৈয়দ আহমদ। ১৮৭৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Anglo Oriental college যা আজকে আলীগড় বিশ্ব বিদ্যালয় নামে বিশ্বে বিশেষস্থান দখল করে আছে। তিনি অনেক Mutual trast (পারস্পরিক সাহায্য সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন। যা মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘ কাল বীমার বিকল্প হিসেবে কাজ করেছে। দেশভাগ হয়ে যাবার পর ভারত সরকার ১৯৫৬সালে তার প্রতিষ্ঠিত সকল সমিতি গুলো জাতীয় করণকরে।

লালা হর কৃষেণ লাল ঃ মূলত লালা কৃষেণ লাল ছিলেন একজন আইন ব্যবসায়ী। ১৮৯৬ সালে তিনি "ভারত" নামের জীবন বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ভারতীয়দের দ্বারা ভারতীয়দের সহায়তার জন্যে এ কোম্পনী প্রতিষ্ঠিত হয়। লালা হর কৃষেন লাল ছিলেন একজন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও আদর্শ দেশ প্রেমিক। তার দেশ প্রেমই তাকে বীমা শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্ধুদ্ধ করেছে।

পান্নালাল ব্যানার্জী ও সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী ঃ বৃটিশ দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠান বর্জন করে দেশীয় দ্রব্য ও প্রতিষ্ঠান এর সেবাগ্রহণে এ উপমহাদেশের সাধারণ মানুষ যখন প্রবল ভাবে আগ্রহী ঠিক তখনই পান্নালাল ব্যানার্জীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় National Insurance Company Ltd. পান্না লালা ব্যানার্জী ছিলেন এক সফল বীমাবিদ। জাতীয় চেতনায় উদ্ধুদ্দ হয়ে মানুষ বীমা পেশায় আকৃষ্ট হোক এবং সকলেই বীমা পেশায় জড়িত হোক এটিই ছিল তার প্রধান দৃষ্টি ভঙ্গি।

Dhaka University Institutional Repository

পান্নালাল ব্যানার্জীর পুত্র প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী পরবর্তী পর্যায়ে ন্যাশনালের পরিচালনা পর্ষদে যোগদান করেন। এস,এন ব্যানার্জীর মত বাগ্মী ও সফল রাজনীতিবিদ ন্যাশনাল বোর্ডে থাকার ফলে কোম্পানীর ভাবমূর্তি অনেক বেড়ে যায়।

সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বৃটিশ ভারতে প্রথম ভারতীয় আমলা সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ধনাঠ্য পরিবারের ছেলে সুরেন্দ্র নাথ এর পক্ষে বিলাস বহুল জীবন যাপন করার সুযোগ থাক সত্ত্বে ও তিনি জীবন বীমা ব্যবসাকে জীবনের একটি মহাব্রত হিসেবে ধরে নিয়েছেন। ১৯০৭ সালে তিনি " হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিউরেন্স সোসাইটি" প্রতিষ্ঠা করেন । ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিপুল পুঁজি সৃষ্টি করে তা বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশ উন্নয়নের সুযোগ বীমার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। তিনি "হিন্দুস্তান" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা পূর্ণ রূপে কাজে লাগিছেন।

নলিনি রঞ্জন সরকার ঃ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নলিনি রঞ্জন সরকার ছিলেন ময়মনসিংহের অধিবাসী । তিনি ১৯১১ সালে হিন্দুস্তান কো- অপারেটিভের একজন কেরানী রূপে কাজে যোগদান করেছেন। দক্ষতা বলে ক্রমান্বয়ে তিনি "হিন্দুস্তান কো-অপারেটিভের" জেনারেল ম্যানেজার পদে পদোন্নতি লাভ করেন ১৯৩২ সালে। ১৯২৩ সালে তিনি আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ. কে. এম. ফজলুল হকের মন্ত্রি সভায় তিনি অর্থমন্ত্রির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ভারতীয় চেম্বার অব কমার্সের ও সভাপতি নির্বাচিত হন। " হিন্দুস্তানের" বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি আবেগময়ী বক্তৃতায় বলেছিলেন It is because of the Hundustan that I am what I am to day. It is the Hindustan which provide me training ground for large public life.

স্যার ফিরোজ সেথনা ঃ পার্শী সম্প্রদায় ভূক্ত স্যার ফিরোজ সেথনা বোম্বে থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভের পর পিতার ব্যবসা দেখেশুনা শুরু করেছেন । পরবর্তীতে তিনি সেচ্ছায় বীমা পেশায় যোগদান করেন ১৮৫১ সালে "সান লাইফ অবকানাডা" এর একজন মাঠকর্মী হিসেবে। দীর্ঘ ২৩ বছর তিনি "সান লাইফ অব কানাডার" বিভিন্ন পদে চাকুরী করে এ কোম্পানীকে একটি জনপ্রিয় কোম্পানীতে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতের প্রায় সকল বড়বড় শহরে এর শাখা খোলার পর কলম্বো ও রেঙ্গুনে ও শাখা অফিস খোলা হয়। সান

Dhaka University Institutional Repository

লাইফ অব কানাডা এর জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে ভারত, বার্মা ও শ্রীলংকাতে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯১৬ সালে তিনি বৃটিশ সরকার কর্তৃক O.B.E. এবং ১৯২৬ সালে "নাইট" উপাধী লাভ করেন।

পন্ডিত মতিলাল নেহেরু ঃ ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রি জওহরলাল নেহেরুর পিতা ছিলেন পন্ডিত লাল নেহেরু। তিনি ভারতীয় বীমা কোম্পানী সমূহের উদ্যোক্তা ও অন্যতম পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন। তিনি " হিন্দুস্তান ইন্সিউরেন্স কোম্পানীর" চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৮৮৫ সালে মাদ্রাজে "লক্ষী" বীমা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত "ট্রপিক্যাল" ইন্সিউরেন্স কোম্পনী" এর পরিচালক ছিলেন।

হাকিম আজমল খান ও ডঃ এম. এ. আনসারী ঃ ভারতীয় উপমহাদেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বীমা ব্যবসায়ীর মধ্যে হাকিম আজমল খান ও ডঃ এম. এ. আনসারী ছিলেন অন্যতম। ১৯২৭সালে দিল্লীতে Tropical Insurance কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ডঃ এম. এ. আনসারী ১৯৩৮ সালে বীমা আইনের আওতাধীনে Insurance Supervisor নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় বীমা সমস্যা চিহ্নিত করন ও সমাধানের জন্যে Insurance Administrator বোর্ড গঠন করা হয় এবং ডঃ এম. এ. আনসারী এ কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

জ্ঞান চন্দ্র দস্তীদার ঃ বরিশালের কৃতি সন্তান ছিলেন বাবু জ্ঞান চন্দ্র দস্তীদার। কাঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে তিনি নিজেকে একজন সফল বীমা কর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। ১৯১২ সালে আইনের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই একটি বৃটিশ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী তে শিক্ষানবীশ হিসেবে যোগদান করেন। দু বছর পর তৎকালীন "প্রভিন্সিয়াল ইন্সিউরেন্স" এর সচিব পদে যোগদান করেন। ক্রমান্বয়ে, তিনি বীমা জগতে অদ্বিতীয় ব্যক্তিতে পরিচিত হন। দীর্ঘ দিন তিনি All Indian Field worker Association এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি Indian Insurance Inslitute এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।[৩৩]

---

৩৩ ইসলামী জীবন বীমা, কাজী মুর্তুজা আলী, পৃ: ২৪- ২৮

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালে বৃটিশদের থেকে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বিভক্তি পূর্ব কালে ১৯০ টি জাতীয় ও ২০ টি বিদেশী বীমা কোম্পানী ব্যবসা করতো কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে মুসলিম পরিচালিত কোম্পানী ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বেশীর ভাগ কোম্পানীই তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে মোট ৭৬ টি বীমা কোম্পানী ব্যবসা করত। তন্মধ্যে পাকিস্তানী কোম্পনীর সংখ্যা ছিল ৮টি মাত্র। তখন ৫টি ভারতীয় কোম্পানী পাকিস্তানে জীবন বীমা ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে তা হল নিউ ইন্ডিয়া, বোম্বে লাইফ, বৃটিশ ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল ইন্সিউরেন্স, জেনারেল ইন্সিউরেন্স। পরবর্তীতে ভারত সরকার জীবন বীমা ব্যবসা জাতীয় করণ করার ফলে উল্লেখিত ভারতীয় কোম্পনীগুলো পাকিস্তানে বীমা ব্যবসা বন্ধ কর দেয়। ১৯৫২ সালে যুক্ত রাষ্ট্রের "আমেরিকান লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী" এদেশে জীবন বীমা ব্যবসা শুরু করে। ১৯৫২ সালে পাকিস্তানির সরকার জারী করে " পাকিস্তান ইন্সিউরেন্স এক্ট ১৯৫২"। ১৯৫৩ সালে " পাকিস্তান ইন্সিউরেন্স কর্পোরেশন" এবং পাকিস্তান সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় বীমা ব্যবসা পাকিস্তান বীমা সমিতির সদস্যভূক্ত দেশী বীমা কোম্পানী গুলোর মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করে। ১৯৫৮ সালে বাঙ্গালী জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান "হোম লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লিঃ" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬১ সালে ঢাকায় ইষ্ট পাকিস্তান কো- অপারেটিভ ও চট্টগ্রামে ইষ্টার্ন ইন্সিউরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৭ সালে " ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ও ইষ্ট বেঙ্গল মিউচুয়্যাল " কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩৪]

---

[৩৪] প্রবন্ধ ইসলামী জীবন বীমা, কাজী মুর্তুজা আলী।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ও বীমা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। সমস্যা জর্জরিত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বীমা ব্যবসা নানা রকম সমস্যার সম্মুখিন হয়েছিল। ক্রমান্বয়ে এসব সমস্যার সমাধান হতে থাকে। বাংলাদেশ সরকার বীমা ব্যবসা কে জাতীয় করণ করে এদশের জনগণের স্বার্থে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়। জীবন বীমা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান । বাংলাদেশ সরকার সর্ব প্রথম ২৫ মে জানুয়ারী ১৯৭২ সালে এক অধ্যাদেশ জারী করে ২৯ টি পাকিস্তানী বীমা কোম্পানী পরিচালনার জন্যে এ্যাডমিনিষ্টেটর নিযুক্ত করে। (Bangladesh taking over of control and Managment of Industrial and commercial concems order. 1972) সামগ্রিক ভাবে দেশের বীমা শিল্প অনুশাসনের জন্যে সরকার পাকিস্তানের ইন্সিউরেন্স কর্পোরেশনের অনুরূপ বি. আই. সি. অর্থাৎ বাংলাদেশ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন গঠন করার চিন্তা ভাবনা করে। সে অনুযায়ী সরকার Bangladesh Insurance corporation orde 1972 অধ্যাদেশ জারীকরে বি. আই. সি. গঠন করে । এ কর্পোরেশন গঠন হলে "পাকিস্তানে ইন্সিউরেন্স কর্পোরেশন" বাতিল বলে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৫২ সালে জারীকৃত পাকিস্তান ইন্সিউরেন্স এ্যাক্ট ও বাতিল হয়ে যায়। বি. আই. সি. চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন মরহুম এম. এ. সামাদ ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে মরহুম মুজিবর রহমানেকে নিয়োগ করা হয়। ১৯৭২ সারে ৮ ই আগষ্ট Presidential order 95 of 1972 জারী করে বাংলাদেশে বীমা শিল্প কে জাতীয় করণ করা হয়। ১৯৭৩ সালে ১৪ই মে ১টি অধ্যাদেশ জারী করে পাঁচটি (Insurance corporation ordinance 1973) কর্পোরেশন ভেঙ্গে দিয়ে সরকার প্রতিষ্ঠিত করলেন দু'টি কর্পোরেশন । জীবন বীমার জন্যে জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং সাধারন বীমার জন্যে সরাধারন বীমা কর্পোরেশন।[৩৭]

Presidential order no. 161, 30 th December 1972 (The Bangladesh Insurance corporation, order 1972) জারী করে সরকার বি. আই. সি. কে বাতিল করে দেয়। এ কর্পোরেশনের সমস্ত দায় এবং সম্পত্তি এবং সকল অফিসার ও কর্মচারী তিস্তা বীমা কর্পোরেশনে অর্পন করা হয়।

---

[৩৭] সাধারণ বীমা অ.আ. ক. খ. এম. এ সামাদ, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

বীমা ব্যবস্থা বেসরকারী খাতে প্রদান ঃ এরশাদ সরকার দেখলেন যে, রাষ্ট্রীয় খাতে বীমা শিল্প যথাযথ ভাবে অগ্রসর হচ্ছে না। তাই ১৯৮৪ সালের ১১ই আগস্ট The Insurence (Amenedment) Ordinance 1984 জারী করে বীমা ব্যবসায় ইচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে বেসরকারী খাতে বীমা কোম্পানী গঠন করার আমন্ত্রন জানালেন।

বাংলাদেশ ইন্সিউরেন্স একাডেমী ঃ বীমা বিষয়ে গবেষণা,শিক্ষাও প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে উন্নত বিশ্বে যে ভাবে বীমা একাডেমী প্রতিষ্ঠা হয়েছে সে ভাবে বাংলাদেশে ও বীমা শিল্পের বিকাশের জন্যে অনুরূপ একটি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা দরকার বলে এম. এ. সামাদ তদানীন্তন বানিজ্য মন্ত্রি মরহুম কামরুজ্জামানকে মতামত দান করেন। মন্ত্রিকাম রুজ্জামান একমত পোষণ করলে ১৯৭৩ সালে ধানমন্ডিতে জাতীয় বীমা কর্পোরেশনের পরিত্যাক্ত ছোট একটি কক্ষে - একজন পিয়ন ও একজন স্টেনো নিয়ে এম. এ. সামাদ বীমার একাডেমির কাজ আরম্ভ করেন।বর্তমানে তা বহু তল ভবনে পরিণত হয়ে বীমা শিল্পের উন্নয়নে সঠিক ভূমিকা পালন করছে।[৩৬]

---

৩৬ সাধারণ বীমা অ. আ. ক. খ. এম. এ সামাদ পৃ. ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী বীমার বিকাশধারা

ইসলামী বীমা সম্পর্কে ধারণা ঃ মানব জীবনে সার্বিক অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নতির দিক নির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। মানব সৃষ্টির গোড়ার থেকে জীবন নির্বাহের প্রেক্ষাপটে একে অপরকে সহযোগীতার মাধ্যমে সুদৃঢ় ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তুলতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহর রাসুল (স) বলেছেন-

عن ابي هريرة رضي الله تعالي عنه ان رسول الله (صـــــــ) قـــال لا تناجشـــوا و لا تحاسدوا و لا تباعضوا و لا تدابروا و كونوا عباد الله اخوانا [১]

অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসুল (স) বলেছেন- তোমরা পরস্পর দোষ খোজাখুজি করো না, পরস্পর হিংসা করো না, পরস্পর ক্রোধান্বিত হবে না এবং একজনের অনুপস্থিতে সমালোচনা করবে না। আর তোমরা আল্লাহর ওয়াস্তে ভাইয়ে ভাইয়ে পরিণত হয়ে যাও।

তাই মানুষ তার মাধ্যমে জীবনের নিরাপত্তা বিধান করতে বিভিন্ন উপায় আদিকাল থেকেই গ্রহণ করে আসছে। এ উপায় পর্যায়ক্রমে উন্নতি লাভ করে আসছে। বীমা হল মানব জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার একটি দিক। অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে নিরাপত্তা শুরুর নির্দিষ্ট কোন সময় উল্লেখ করা দুরুহ। তবুও আমি এর একটি সম্ভাবনাময় সময় নিয়েই শুরু করছি।

প্রথম পর্যায় ঃ ইসা (আ)-এর জন্মের ও হাজার বছর পূর্বে মিশরের বাদশা রায়হান স্বপ্নে দেখেছেন যে ৭টি দুর্বল গরু ৭টি সবল গরুকে এবং ৭টি শুকনা ধানের শীষ ৭টি সতেজ ধানের শীষ খেয়ে ফেলেছে। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা খুজতে খুজতে সর্বশেষ হযরত ইউসুফ (আ)-এর কাছে আসলে তিনি বললেন যে, মিশরে এখন থেকে ৭টি বছর অধিক ফসল উৎপন্ন হবে আর পরবর্তী ৭টি বছর দুর্ভিক্ষে কাটবে। এ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য বাদশাহ রায়হান হযরত ইউসুফ (আ)-কে অর্থমন্ত্রীসহ সার্বিক দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন।[২]

---

১ বুখারী শরীফ ২য় খন্ড আরবি সংস্করণ, পৃঃ ৮৯৬।

২ তাফসিরে মারেফুল কুরআন, বাংলা সংস্করণ (সংক্ষিপ্ত) পৃ- ৬৭৩

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ইউসুফ (আ) প্রথম সাত বছর থেকে পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সাত বছরের জন্য ফসল সঞ্চয় করে রেখেছেন এবং দুর্ভিক্ষের সময়ের প্রজা সাধারণের জীবনের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দান করেছেন। আর কোরানে উল্লেখ আছে-

- -- -- ... -- وقال الملك اني اري سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلت خضر واخر يابست. [৩]

অর্থাৎ, বাদশাহ বললেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি ৭টি সতেজ গরুকে ৭টি দুর্বল গরু খেয়ে ফেলছে এবং ৭টি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো শুষ্ক।

ইসলামী ইন্সিওরেন্সের সূচনা নির্ধারণ করা কঠিন। রাসুল (স)-এর পূর্বেও আরবের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ইন্সিওরেন্স সাদৃশ সহযোগিতার ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

<u>প্রাচীন আরব উপজাতীয়দের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা</u> ঃ বর্তমানে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা মহানবী (স) এর আমলে ছিল না। তবে পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যবস্থা রাসুল (স)-এর পূর্বেও আরব উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কোন প্রচলিত বিষয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শরীয়ত সাংঘর্ষিক না হলে ইসলামে তা গ্রহণযোগ্য। যেমন ইমাম আবু হানিফা (র) সামাজিক প্রচলনকে ইসলামী বিধান প্রণয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিভিন্ন দুর্যোগকালীন সময়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই বীমার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম আগমণের পূর্বে আরব গোত্রের মধ্যে এ পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি পূর্ণ রূপে বিদ্যমান ছিল। এটি তখনকার একটি সমাজিক দন্ডবিধির ও একটি ধাপ ছিল। যে কোন গোত্র অন্য কোন গোত্রের সদস্যের দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে উক্ত গোত্রের সকলে মিলে ক্ষতি পূরণ করত। কোন পরিবার বা গোত্রের কেউ অন্য পরিবার বা গোত্রের কোন সদস্য দ্বারা অনিচ্ছাকৃতভাবে নিহত হলে হত্যাকারীর পরিবার বা গোত্র খুনের মুক্তিপণ স্বরূপ সম্পদ একত্র করত এবং হত্যাকারীকে দায় থেকে মুক্ত করত। নিহত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়কে দিয়াত (রক্তের মূল্য) প্রদানের মাধ্যমে সাহায্য করত। রাসুল (স)-এর নবুয়তের পূর্বে বণিকরা বা বাণিজ্যিক সফরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকে সহযোগিতার জন্য একটি যৌথ তহবিল গঠন করত। উল্লিখিত সহযোগিতার সকল ক্ষেত্রেই আকিলা ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ছিল।

---

৩ আল কুরআন সূরা ইউসুফ আয়াত নং ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

আর আকিলা হল সুপরিচিত একটি প্রথা। العقل শব্দ থেকে আকিলা (عاقلة) শব্দের উৎপত্তি। العقل (আল আকলু) শব্দের অর্থ নিহত ব্যক্তির রক্তপণ আদায় করা।[৪]

ড. মুহাম্মদ মহসিন খানের মতে আকিলা অর্থ- আসাবা।[৫] যা হত্যাকারীর পৈত্রিক আত্মীয়দের বুঝায়। তাই প্রাচীন আরব গোত্রগুলোর মধ্যে প্রচলিত আকিলা মতবাদের মূল ধারণা হল- সে সব গোত্রের প্রত্যেক সদস্যই নিহতের উত্তরাধিকারীকে ক্ষতিপূরণের জন্য হত্যাকারীর পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য দিতে প্রস্তুত থাকা। এ ধরণের আর্থিক চাঁদার নাম দিয়ত বা রক্তমূল্য।

<u>রাসূল (স)-এর অনুসৃত নীতি</u> ঃ রাসূল (স)-এর নবুয়াতের পূর্বের ও পরের উভয় পর্যায়ের জীবনই ছিল মানবতার খেদমতে নিবেদিত।

<u>হিলফুল ফুজুল</u> ঃ রাসুল (স)-এর নবুয়াতের পূর্বে ফুজ্জারের যুদ্ধের পর নিষিদ্ধ ঘোষিত জিলক্বদ মাসে হিলফুল ফুজুল সংঘটিত হয়। কয়েকটি গোত্র যেমন কোরায়েশ অর্থাৎ বনি হাশিম, বনি মোত্তালিব, বনি আসাদ, ইবনে আবদুল ওযযা, বনি যোহরা ইবনে কিলাব এবং বনি তাইম ইবনে মোররা এর ব্যবস্থা করেন। তারা আবদুল্লাহ ইবনে জুদআন তাইমির ঘরে একত্রিত হন। তারা বয়সে এবং অভিজাত্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন। এরা পরস্পর এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, মক্কায় সংঘটিত যে কোন প্রকার যুলুম অত্যাচার প্রতিরোধ করবেন।[৬]

মক্কার অধিবাসী হোক বা বাইরের কেউ হোক অত্যাচারিত হলে অত্যাচারের প্রতিকার করে তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হবে। এ চুক্তি অনুষ্ঠানে রাসূল (স) ছিলেন বয়সে সকলেরই ছোট। এ চুক্তি সম্পাদনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। নবুয়তের পরে তিনি এ ঘটনা উল্লেখ করে বলতেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের ঘরে এমন চুক্তিতে শরিক ছিলাম। যার বিনিময়ে লাল উটও আমার পছন্দ নয়। ইসলামী যুগে যদি সে চুক্তির জন্যে আমাকে ডাকা হত তবে আমি অবশ্যই সে ডাকে সাড়া দিতাম।[৭]

---

৪ অভিধান (المنجد) পৃষ্ঠা- ৫২০

৫ ড. মুহাম্মদ মোহসিন, অনুবাদ সহীহ আল বুখারী, কাজী পাবলিকেশন্স লাহোর, পাকিস্তান ১৯৭৯, পৃঃ ৩৪।

৬ আররাহিকুল মাখতুম, ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, বাংলা সংস্করণ, পৃঃ ৮১।

৭ ইবনে হিশাম- ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩, মুখতাছারুস সীরাত- শেখ আবদুল্লাহ, পৃঃ ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

এ চুক্তির মূলে ছিল জাহেলী যুগের বে-ইনসাফী দূর করা, ক্ষতিগ্রস্থকে ক্ষতিপূরণে সাহায্য সহযোগিতা করা।

হিলফুল ফুজুলের ধারা ঃ রাসূল (স)-এর আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই আরবে প্রতি বছর উকাজ মেলা নামে একটি মেলা বসত। এতে বিভিন্ন গোত্র নিজ গোত্রের গৌরব গাথার সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষে গোত্রের কুৎসা রটনা করত।

এমনি একটি ঘটনা থেকে দুগোত্রের তথা বনু কেনানা ও কায়সে আয়নাল এর মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। বনু কেনানা গোত্রের মিত্রশক্তি হওয়ার কারণে কোরাইশরাও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। কোরাইশ নেতা আবু তালিব শুধু মিত্রতার কারণে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। ফলে তার আত্মীয় স্বজন ও যুদ্ধে জড়িয়ে পরেন। এমনকি কিশোর নবীকেও যুদ্ধ ময়দানে যেতে হয়েছে। তিনি পিতৃব্যদের সঙ্গে থেকে তাদেরকে তীর কুড়িয়ে দিতেন। [৮]

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোরাইশদেরকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে এবং অহেতুক তারা প্রাণ হারাচ্ছে। এ যুদ্ধ পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এতে সব পক্ষের কত যে প্রাণহাণী ও সম্পদ হানী হয়েছে তার কোন হিসেব নাই। এ যুদ্ধের নাম হল ফুজ্জারের যুদ্ধ।

মহানবী (স) এ ধরনের অর্থহীন যুদ্ধ, সম্পদ ও প্রাণহানী দেখে খুবই ব্যথিত হন। তিনি দেখলেন ন্যায়-অন্যায় বলতে কিছুই নেই। অন্যায় জেনেও গোত্রের লোক হিসেবে সমর্থন করে যুদ্ধ করতে হয়। এটা তার কাছে খুবই খারাপ লাগল। তিনি এ যুদ্ধের পর একটি সর্বদলীয় কল্যাণমুখী সেবা সংগঠন গঠন করলেন। নাম দিলেন হিলফুল ফুজুল বা শ্রেষ্ঠদের শপথনামা।

চাচা জুবায়ের তার সঙ্গী হলেন। তিনি ফুজ্জারের যুদ্ধে কোরাইশদের পতাকাবাহী ছিলেন। রাসূল (স) ও চাচা জুবায়ের মিলে গোত্রের তরুণদেরকে এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বুঝিয়ে দিলে অনেক কল্যাণকামী ও উদ্যোমী তরুণ এতে যোগদান করে।

যুদ্ধহতদের সেবার উদ্দেশ্যে এ সংগঠনের সূচনা হলেও যাতে আর কোন যুদ্ধ সংঘটিত না হতে পারে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। সংগঠনের পাঁচটি ধারার উপর সকল সদস্যকে মহান আল্লাহর নামে শপথ করালেন যাতে কোন ব্যক্তি স্বার্থ প্রাধান্য না পায়। সে পাঁচটি ধারা হল-

---

[৮] তারীখে খাযরামি ১ম খন্ড, পৃঃ ৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

১। আমরা নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদের সেবা করব।

২। অত্যাচারিকে প্রাণপণে বাধা দিব।

৩। মজলুম বা নির্যাতিতকে সাহায্য করব।

৪। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করব।

৫। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করব। [১]

রাসূল (স)-এর গড়া হিলফুল ফুজুলের প্রথম ধারাটিই হল আজকের ইসলামী বীমার কর্মপন্থা।

---

[১] বিশ্বনবী, গোলাম মোস্তফা, পৃঃ ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

নবুয়ত প্রাপ্তির পরবর্তী জীবন

আকিলা প্রথার অনুমোদন ঃ রাসুল (স) প্রাচীন আরবের আকিলা প্রথাকে গ্রহণ করেছেন। তিনি হোযাইল গোত্রের দুজন মহিলার মধ্যকার বিবাদ আকিলা ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাধান করেছেন। [১০] যেমন- হাদীসে উল্লেখ আছে-

عن ابي هريرة (رضـــ) قال اقتلت امرتان من هزيل فرمت احداهما الاخري فقتلتـــها وما في بطنها فاختصموا الي النبي (صـــ) فقضي ان دية جنينها غرة عبد او وليدة وقضي دية المراة علي عاقلتها (البخاري) [১১/১২]

অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, হোযাইল গোত্রের দুজন মহিলার মধ্যে ঝগড়া হলে একজনের পাথরের আঘাতে অপর মহিলা ও তার গর্ভের সন্তান নিহত হয়। নিহত মহিলার উত্তরাধিকারীগণ মহানবী (স)-এর নিকট বিচার প্রার্থী হয়। তিনি হত্যাকারিণীর আকিলাকে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষেত্রে একটি কৃতদাস বা দাসী মুক্ত করতে এবং নিহত মহিলার ক্ষেত্রে রক্তমূল্য পরিশোধের নির্দেশ দিলেন।

হযরত আলী (রা)-কে হযরত আবু হোযায়ফা (রা) জিজ্ঞাসা করলেন-

هل عندكم شئ ما ليس في القران؟ [১২/১৮]

অর্থাৎ, আপনার নিকট এমন কোন জ্ঞান আছে যা কুরআনে নেই? উত্তরে তিনি বললেন-

والذي خلق الحبة وبرء النسمة ما عندنا الا في القران —

অর্থাৎ, যে আল্লাহ দানা বিদীর্ণ করেছেন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার নামে শপথ করে বলছি, আমার নিকট যা কিছুই আছে তা কুরআনে উল্লেখ আছে।

তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তাতে কি লিখা আছে? উত্তরে আলী (রা) বলেছেন-

العقل وفكاك الاسير وان لا يقتل مسلم بكافر.

---

১০ ফতহুল বারী, ইবনে হাজার আসকালানী- ১২শ খণ্ড

১১ ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী ফাউন্ডেশন, পৃঃ ৭

১২ বোখারী শরীফ باب العاقلة , ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিম, পৃঃ ৯৩ ও ৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, রক্তমূল্য আদায়, বন্দি মুক্তকরণ এবং কোন কাফিরের হত্যাকারী মুসলমান হলে দণ্ড স্বরূপ তাকে হত্যা করা যাবে না।

হযরত আলী (রা) তার সহিফায় রক্তমূল্য সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে-

ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الي اهله.[১৩/১২]

অর্থাৎ, যদি কেউ কোন মুমিন ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা করে তাহলে দণ্ড স্বরূপ তাকে একজন মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নিকট দিয়াত পৌছিয়ে দিতে হবে।

আয়াতে دية (দিয়াতুন) বলে রক্তমূল্য বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ভুলক্রমে কারো দ্বারা কোন মুসলমান নিহত হলে তাকে দুটি কাজ করতে হবে (ক) একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করা। (খ) নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নিকট দিয়াত পৌছে দেয়া। আর এ দিয়াত পরিশোধ করার দায়িত্ব ইসলামী আইন অনুযায়ী হত্যাকারী আকিলার উপর অর্পিত। আকিলা ইসলামী আইনে গৃহীত একটি পরিভাষা, যার অর্থ হলো- হত্যাকারীর সাথে সম্পর্কিত পৈত্রিক উত্তরাধিকারীগণ।

এ রক্তমূল্য হত্যাকারী নিজে দিবে না। কারণ রক্তমূল্য যদি একা হত্যাকারীকে আদায় করতে বাধ্য করা হয় তা হলে সে দারিদ্র কবলিত হয়ে পড়বে এবং তার দারিদ্রের কারণে চরম বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হবে। এ কারণে তা আদায় করার দায়িত্ব আকিলা বা হত্যাকারীরর পুরুষ নিকটাত্মীয়দের উপর চাপানো হয়েছে। যারফলে কাউকেই দারিদ্র্য কবলিত হতে হবে না।[১৪]

ইবনে হাজার আসকালানী আরও লিখেছেন, যদি আশঙ্কা করা হয় যে, হত্যাকারী পুনরায় হত্যাকান্ড ঘটাতে পারে, তাহলে এক ব্যক্তির বিরত থাকার প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে গোষ্ঠীর লোকদের তাকে এরূপ হত্যাকাণ্ড ঘটানো থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা অধিক কার্যকর হবে বলে ধারণা করা যায়।

---

[১৩] সূরা আন-নিসা, আয়াত- ৯২।

[১৪] ফতহুল বারী- ইবনে হাজার আসকালানী, খণ্ড- ১২, পৃঃ ২৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম কুরতুবী লিখেছেন সন্দেহ নাই যে, জরিমানা গ্রহণ ও হারানো বা বিনষ্ট জিনিস বাবদ দেয়া ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মৌলিক নিয়ম-বিধির সম্পূর্ণ বিপরীত আকিলার উপর সহানুভূতি প্রদর্শনের বাধাবাধকতা করা হয়েছে। তবে আকিলার উপর এ বাধ্যবাধকতা আরোপ কঠোরতা স্বরূপ করা হয়নি। এর মাধ্যমে হত্যাকারীর অপরাধটাও তাদের উপর চাপানো হয়নি। মূলত: এ ব্যাপারটি নিছক সহানুভূতি ও বিপদ ভাগাভাগী করে নেয়ার একটি ব্যবস্থা মাত্র।

ইমাম আবু হানীফা (র) এরূপ সাহায্য কর্মের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ইমাম আবু হানীফা আকিলা দ্বারা এমন সকল গোষ্ঠীভুক্ত লোকদেরকে বুঝিয়েছেন যারা পারস্পরিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও উপহার আদান-প্রদানের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

নবী করিম (স) থেকে এ বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ভুলক্রমে সংঘটিত হত্যাকান্ডের দিয়াত বা রক্তমূল্য দিয়ে পরিশোধ করার দায়িত্ব আকিলার বলে ফয়সালা দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সকলেই একমত।[১৫]

আল্লামা আবু বকর আল-জাসসাস এ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, কুরআনের আয়াতে দিয়াত এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা কে শোধ করবে, হত্যাকারী না আকিলা তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয় নাই। এ বিষটি রাসূল (স) বহু মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। দিয়ত আকিলাকে পরিশোধ করতে হবে। সকল ইমামগণ এতে একমত পোষণ করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (স) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যে চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করেছেন তাতে স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে, তারা পরস্পরের আকিলা হয়ে রক্তমূল্য আদায় করবে।[১৬]

একটি সন্দেহ ও সমাধান ঃ যদি হত্যাকারীর উপর অর্পিত দিয়াত আকিলার উপর বর্তায় তাহলে তা নিম্ন বর্ণিত কুরআন ও হাদীসের বিপরীত বলে মনে হয়। কুরআন ও হাদীসের বিপরীতে কোন কাজ শরীয়াত সম্মত হতে পারে না। কুরআনের বাণী-

ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخري–[১৭/১৭]

---

[১৫] আল জামেউ লি-আহকামিল লিলকুরতুবী- খন্ড- ৫, পৃঃ ৩২০

[১৬] আহকামুল কুরআন, আল-জসসাস, খন্ড-২, পৃঃ ২৭২

[১৭] সূরা আল-আনআম, আয়াত ১৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, প্রত্যেকেই যা উপার্জন করবে তা তার উপরই বর্তাবে এবং কোন বোঝা বহনকারীই অন্য কারো বোঝা বহন করবে না।

রাসূল (স) এরশাদ করেছেন- لا يوخذ الرجل بجريرة ابيه ولا بجريرة اخيه

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তিই তার পিতার অপরাধে দায়ী হবে না এবং তার ভাইয়ের অপরাধেও দায়ী হবে না।

রাসূল (স) আবু রমসা ও তার ছেলেকে বলেছেন- انه لا يجني عليك ولا تجني عليه

অর্থাৎ, সে তোমার উপর অপরাধ চাপাবে না। তুমিও তার উপর অপরাধ চাপাবে না।

সাধারণ বিবেক বুদ্ধিও কোন লোককে অপর লোকের অপরাধে পাকড়াও করাকে কোনক্রমেই সমর্থন করতে পারে না। [১৮]

সমাধান ঃ উল্লেখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, একের অপরাধে অন্য কাউকে অভিযুক্ত বা দায়ী করা যাবে না। দিয়াত বা রক্তমূল্য পরিশোধ করা আকিলার উপর কর্তব্য নয়, একথা প্রমাণ করে না। আর আকিলার উপর রক্তমূল্য আদায় করার বাধ্যবাধকতা অপরাধীর অপরাধে পাকড়াও করার ভিত্তিতে নয়। মূলতঃ দিয়াত আদায় করা হত্যাকারীর উপরই আবশ্যিক হওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু তা হত্যাকারীর পুরুষ নিকটাত্মীয়দের উপর আদায় করার বাধ্যবাধকতার কারণ হল তাদের উপর রক্তমূল্য আদায়ের বাধ্যবাধকতা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে। অন্য কারো কৃত অপরাধে তাদেরকে অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত করার ভিত্তিতে নয়।

আল্লাহ ধনীদের ধন সম্পদে গরীবদের অধিকার সাব্যস্ত করেছেন। তাও কোন অপরাধের ভিত্তিতে নয়। বরং এটি হল পারস্পরিক সহানুভূতি ও একের দুঃখ ও বিপদ সকলে ভাগ করে নেয়ার একটি মৌলনীতি। আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীদের প্রতি কর্তব্য পালন ও তাদের হক আদায় করার নির্দেশ একই দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে প্রদান করেছেন।

ভুলবশতঃ হত্যাকারী ব্যক্তির প্রদেয় রক্তমূল্য আদায় আকিলার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

علي جهة المواساة من غير احجاف بهم وبه. [১৯]

---

[১৮] ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম পৃঃ- ৯৬

[১৯] আহকামুল কুরআন আল-জাসসাস খন্ড-২, পৃঃ- ২৭২

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ. তাদের ও তার উপর কোনরূপ অবিচার মূলক আচরণ ব্যতিরেকেই পারস্পারিক সান্ত্বনা স্বরূপ এবং তারই মূলনীতি অনুযায়ী।

আল-জাসসাস বলেছেন, দিয়াত দেয়ার দায়িত্ব আকিলার উপর অর্পণ করার মূলে কতগুলো বিবেক সম্মত কারণ রয়েছে।

এক. হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত সম্পদ দেয়ার দায়িত্ব আকিলার উপর আল্লাহ তায়ালা অর্পণ করেছেন। যদিও তারা হত্যাকারী নয়। এ দায়িত্ব অর্পণের উদ্দেশ্যে আকিলাগণকে আল্লাহ তায়ালার একটি মহান ইবাদত পালন করার সুযোগ দান। আর এ একই উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ তায়ালা ধনী লোকদের ধন-সম্পদ থেকে ফকিরকে সদকা দানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছেন।

দুই. দিয়াত দেয়ার কর্তব্য আকিলার উপর সাহায্য-সহযোগিতা স্বরূপ চাপানো হয়েছে।

হানাফি মাযহাবে নিকটাত্মীয়দের পরিবর্তে একই রেকর্ডভুক্ত লোকদেরকে আকিলা সাব্যস্ত করা হয়েছে। দিয়াত আদায় করার দায়িত্ব ও এ একই রেকর্ডভুক্ত লোকদের উপর বর্তাবে। কারণ তারাই পরস্পরের সাহায্যকারী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

তিন. আকিলার উপর দিয়াত দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করার তাদের মধ্যে শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি দূর করার একটি সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা। কারণ তারা পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সখ্যতার মুখাপেক্ষী। যে দুজনের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা রয়েছে তাদের একজন যদি অপর জনের অর্পিত বোঝা বহনে এগিয়ে আসে তবে তাদের মধ্যে বিরাজিত শত্রুতা ও বিদ্বেষ অবশ্যই দূর হয়ে যাবে, পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতার উন্মেষ ঘটাবে এবং দুজনের সম্পর্ক অত্যন্ত আন্তরিক ও মধুর হবে। কারো মনে যদি কোন ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা জেগেও থাকে আর এ অবস্থায় সে তার সাহায্য ও ঝুকি বহনে এগিয়ে আসে তাহলে অবশ্যই তার মনের মালিন্য দূরীভূত হয়ে যাবে এবং পরম সান্তনা, স্বস্তি, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভাবধারায় তার হৃদয় ভরপুর হয়ে উঠবে।

চার ঃ একজনের ভুলক্রমে করা অপরাধের দণ্ড ও ঝুকি বহনে যদি অন্যজন এগিয়ে আসে তাহলে অন্যজনের বিপদেও সে অনুরূপভাবে সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে বিপদে কেউ নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। বরং তা এক শুভ কল্যাণময় ভাবধারার প্রসার ঘটাবে।[২০]

আলজাসসাস এ চারটি কারণ ব্যাখ্যা করার পর মন্তব্য করেছেন-

فهذه وجوه كلها مستحسنة في العقول غير مدفوعة–[২১]

অর্থাৎ, এ চারটি কারণই সম্পূর্ণরূপে উত্তম ও বিবেকসম্মত। এর কোনটিই প্রত্যাখ্যান যোগ্য নয়।

ইমাম কাসানী লিখেছেন ভুলবশতঃ হত্যার দরুন যে দিয়াত দিতে হয় তা আকিলাকে বহন করতে হয়। এতে হত্যাকারীর উপর অর্পিত বোঝা হাল্কা হয়। ইমাম আবু হানিফা (র)-এর মাযহাবে হত্যাকারীও এ বোঝা বহনে শরীক হতে হবে। কারণ আকিলার মধ্যে সেও একজন। ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মাযহাবে হত্যাকারীকে শরীক করা যাবে না। সমস্ত দিয়ত আকিলাকেই দিতে হবে।[২২]

<u>মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা</u> ঃ আল্লামা ইবনে কাইয়ুম লিখেছেন, নবী করীম (স) হযরত আনাস বিন মালিকের ঘরে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। সে সময় মোট নব্বইজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তার অর্ধেক ছিলেন আনসার। ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মূলকথা ছিল একে অন্যের দুঃখে দুঃখী হবে এবং সুখে সুখী হবে।

এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালী লিখেছেন, জাহেলী যুগের রীতিনীতির অবসান ঘটানো ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং বর্ণগোত্র ও আঞ্চলিকতার পার্থক্য দূর করাই হলো এর লক্ষ্য।[২৩]

<u>সর্বপ্রথম সহযোগিতা চুক্তি মদিনার সনদ</u> ঃ রাসূল (স) মদিনায় হিজরত করার পর পরই এক ধরনের সামাজিক বীমার ব্যবস্থা প্রচলন করেন। আর তা ছিল মদিনার সনদ। এ সনদের একটি ধারা ছিল যে, অভাবগ্রস্ত, অসুস্থ ও দারিদ্র্যদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার লক্ষ্যে একটি সম্মিলিত ফান্ড তৈরি করা হবে। এ ফান্ড থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার ব্যবস্থা করা

---

২০ আল-জামেউ লি-আহকামিল কুরআন খন্ড- ৫ পৃঃ- ৩১৫

২১ আহকামুল কুরআন লি-জাসসাস, খন্ড-২, পৃঃ-২৭৩

২২ বাদায়ীউস সানাঈ, খন্ড- ৭, পৃঃ- ২৫৫

২৩ আর রাহিকুল মাখতুম, ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, বাংলা সংস্করণ পৃঃ ২১০

Dhaka University Institutional Repository

হবে। আরো একটি ধারা ছিল যে, মুহাজিরগণ তাদের ওয়াদা পূরণের জন্য দায়ী থাকবে, তারা রক্তপণ (দিয়ত) প্রদান করবে এবং মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করবে।

মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সহযোগিতা চুক্তি ঃ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের পর রাসুল (স) মুসলমানদের জন্য আরেকটি অঙ্গিকারনামা প্রণয়ন করেছেন। এর মাধ্যমে জাহেলীয়াতের সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত গোত্রীয় বিরোধের বুনিয়াদ সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়। উক্ত অঙ্গিকারনামার দফাগুলোর মধ্যে প্রথমেই ছিল নিম্নোক্ত দফাসমূহ-

এক. এরা সবাই অন্য সকল মানুষের থেকে একটি ভিন্ন জাতি।

দুই. কোরাইশ মুহাজিররা তাদের পূর্বতন রীতি অনুযায়ী পরস্পর মুক্তিপণ আদায় করবে। মোমেনদের মধ্যে সুবিচারমূলকভাবে কয়েদীদের ফিরিয়ে দেবে। আনসারদের সকল গোত্র তাদের পূর্বতন রীতি অনুযায়ী পরস্পর মুক্তিপণ আদায় করবে। তাদের সকলে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ইমানদারদের মধ্যে সুবিচারমূলকভাবে নিজ নিজ কয়েদীদের ফেদিয়া আদায় করিবে।

তিন. ইমানদারগণ নিজেদের মধ্যকার কাউকে ফিদিয়া বা মুক্তিপণের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দান ও উপঢৌকন থেকে বঞ্চিত করবে না।

রাসুল (স) এর আকিলারূপী বীমা ব্যবস্থা ঃ ইসলামের সূচনায় ইসলামী সমাজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নবী করীম (স) আকিলা এর বিধান কার্যকরভাবে চালু করে আধুনিক বীমা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। অন্যকথায় রাসুল (স) বপীত বীজের সেই অঙ্কুরই আজকের দিনে বীমা রূপে এক বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়েছে।[২৪]

হত্যাকারীর যে সকল নিকটাত্মীয় মুক্তিপণ আদায় করতে বাধ্য থাকেন তাদেরকে আকিলা বলা হয়।

মদিনা সনদের তৃতীয় দফায় উল্লেখ আছে যে,[২৫] المهاجرون من قريش علي ربعتهم يتعاقلون بينهم অর্থাৎ, কুরাইশ বংশের হিজরতকারী (মুহাজির) গণ নিজেদের অঙ্গিকারের জন্য দায়ী থাকবেন এবং তারা সকলে মিলেই রক্তপণ আদায় করবে। [২৬]

---

[২৪] ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পৃঃ ৯৯

[২৫] খাতামুন নাবিয়ীন, আবু জাহরা, খন্ড-২, পৃঃ- ৩০।

[২৬] The thesis Insurance with a comparative analysis between common law and Islamic legal thoughts 1997, Dr. Masum Billah P- 17

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত ব্যবস্থাপনা হল সামাজিক বীমার প্রতিচ্ছবি। অন্য কথায় বলা যায় সামাজিক বীমার প্রাথমিক সূচনা হয় মদিনা সনদের মাধ্যমে। মদিনা সনদের ৪ থেকে ২০ ধারা পর্যন্ত সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। গরীব, অসহায় এবং অসুস্থদেরকে সম্মেলিতভাবে সহায়তা করার কথা উল্লেখ আছে।

আকিলা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিহত নির্দোষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের পরিবারকে সাহায্য করা হত। মক্কায় মহানবী (স) যখন হযরত খাদিজা (রা) এর বাণিজ্যিক প্রধান হিসেবে সিরিয়াতে ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। তখন একটি কাফেলার কয়েকজন ছাড়া বাকী সবাই মরুভূমিতে হারিয়ে যায়। উট ও ঘোড়ার মূল্যসহ বাণিজ্যিক মালামালের সমমূল্য ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারকে প্রদানের নিমিত্তে চাঁদা প্রদানকারী এক বোর্ড গঠিত হয়। সে সময় হযরত খাদিজা (রা) মূলধনে ব্যবসায়রত মুহাম্মদ (স) ও চাঁদা প্রদান করেছিলেন।[২৭]

দামুল থাতরে ফিত-তারিক একটি ফৌজদারী দণ্ডবিধি ছিল। ব্যবসায়ীকে সফরে কোন দুর্যোগ বা দুর্ঘটনায় পরে ক্ষতিগ্রস্থ হলে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিপূরণ করতে হত।[২৮]

রাসূল (স) কর্তৃক ৬২৪ সালে প্রণীত মুসলিম বিশ্বের প্রথম সংবিধানে মদীনার জনগণের (মুহাজির, আনসার, ইহুদী ও খৃস্টান) মাঝে তিনটি ধারায় এক ধরনের সামাজিক বীমার প্রবর্তন করেছেন। যা নিম্নরূপ-

<u>প্রথমতঃ</u> দিয়াতের অনুশীলনের মাধ্যমে- হত্যাকারীকে বিশাল বোঝা থেকে মুক্ত করার জন্য নিহতের উত্তরাধিকারীদেরকে দিয়াত (রক্ত মূল্য) প্রদান করবে আকিলা। অর্থাৎ হত্যাকারীর ঘনিষ্ঠ পুরুষ আত্মীয়গণ। মহানবী (স) মদিনা সনদের মাধ্যমে মদীনায় বসবাসকারী বনু আউফ, বনু হারিস এবং অন্যান্য গোত্রগুলো আকিলা প্রথা অনুযায়ী যৌথ সহযোগিতায় রক্তমূল্য পরিশোধে বাধ্য করেন।

<u>দ্বিতীয়তঃ</u> মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে- প্রথম সংবিধানে মহানবী (স) বন্দীদের মুক্ত করার জন্য একটি বিধান প্রণয়ন করেন। এতে বলা হয়েছে যুদ্ধের সময় শত্রুর হাতে কেউ বন্দী হলে বন্দীর আকিলা তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে মুক্তিপণ স্বরূপ চাঁদা দিবে।

---

২৭ প্রবন্ধ ইসলামী জীবন বীমা, কাজী মোঃ মুরতজা আলী, পৃঃ ৪৬,

২৮ প্রবন্ধ ইসলামী জীবন বীমা, কাজী মোঃ মুরতজা আলী, পৃঃ ৪৬,

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স) নির্দেশ দেন যে, কুরাইশ মুহাজিররা দায়ী থাকবে মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে বন্দীদের মুক্ত করার ক্ষেত্রে, যাতে কল্যাণকর ও ন্যায়বিচারের নীতি অনুযায়ী ইমানদারদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও হৃদ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয়তঃ যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে- এ বিধানটি সে সময় মদীনায় বসবাস রত বনু হারিস, বনু নাজ্জার, বনু জুলহাম এবং অন্যান্য গোত্রের মধ্যেও প্রযোজ্য ছিল। এ প্রথম সংবিধানে উল্লেখ ছিল যে, অভাবী, অসুস্থ ও দরিদ্রদের প্রয়োজনীয় সাহায্যের লক্ষে সমাজ পারস্পরিক সহযোগিতামূলক একটি যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। [২৯]

হযরত উমর (রা) এর সময় বীমা ঃ রাসূল (স)-এর সময়ের বীমা প্রক্রিয়া হযরত উমর (রা)-এর সময়ে আরো একধাপ এগিয়ে যায়। হযরত উমর (রা)-এর নির্দেশে (দিওয়ানুল মুজাহিদিন) নামে একটি সংস্থা গড়ে উঠে। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগেও এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদের নাম এ দিওয়ানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে তারা সকলেই একজনের রক্তপণ আদায়ে অনাজন বাধ্য থাকবেন। অর্থাৎ সকলে মিলেই একজনের ক্ষতির ভার বহন করবেন। [৩০]

ইসলামী বীমার উৎসসমূহ ঃ শরীয়তের নীতিমালার লংঘন না হলে বীমা পলিসি বৈধ হবে। ইসলামী বীমা পলিসির প্রতিটি অংশই শরীয়তের বিধানের ভিত্তিতে হতে হবে। ইসলামী বীমার উৎসগুলো দুটি ভাগে বিভক্ত। (১) সাধারণ উৎস (২) সাদৃশ্য মূলক উৎস।

(১) সাধারণ উৎস ঃ ইসলামী আইনের প্রধান দুটি উৎস হল কুরআন ও রাসূল (স) এর বাণী হাদীস শরীফ। এ দুটি হল মৌল উৎস। ইসলামী আইনের অন্যান্য গৌণ উৎস বস্তুত এ দুটি মৌল উৎসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

বীমার মৌলিক উৎসগুলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও আল হাদীসের আলোকে অনুমোদিত হতে হবে এবং একই সাথে গৌণ উৎসগুলোর সাথে ও সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। অধ্যাপক আবদুর রহমান আদদোহ বলেছেন, কুরআনের আদেশগুলো প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত আচরণবিধি, আর হাদীস হল পবিত্র কুরআনের পরিপূরক ও ব্যাখ্যামূলক উৎস।

---

[২৯] ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল, ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, পৃঃ ৩৭

[৩০] সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী ফাউন্ডেশন, পৃঃ-৭

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুরআনের বিধান ঃ সামগ্রিক বিধি-বিধান সংবলিত পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা পাঁচশত। বীমা অর্থ হল পারস্পরিক সহানুভূতির দৃষ্টিতে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা কুরআনে একে (তায়াউন) বলে উল্লেখ আছে। তায়াউন শব্দের অর্থ পারস্পরিক সাহায্য সহানুভূতি প্রদর্শন করা। আল্লাহ তায়ালার বাণী-

وتعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان — [৩১]/৩১

অর্থাৎ, তোমরা কল্যাণকর কাজ সম্পাদন ও খোদাভীতি অবলম্বনে একে অপরকে সাহায্য কর এবং পাপ কাজ সম্পাদন ও শত্রুতা পোষণে একে অপরকে সাহায্য করবে না।

ক্ষতিগ্রস্থকে ক্ষতিপূরণে সহায়তা করা, বিধবা ও এতিমদেরকে জীবন বাঁচাতে আর্থিক সহায়তা করার লক্ষ্যে সুদমুক্ত বীমা প্রতিষ্ঠান কুরআনের ভাষায় وتعاونوا البر و التقوي এর অন্তর্ভুক্ত।

আল হাদীসের বিধান ঃ ইসলামী আইনের উৎসগুলোর মধ্যে কুরআনের পরেই হাদীসের স্থান। আকিলা ভিত্তিক বীমা ব্যবস্থা রাসুল (স) এর দ্বারা অনুমোদিত।

হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, হোযাইল গোত্রের দুজন মহিলার মধ্যে ঝগড়া হলে একজনের পাথরের আঘাতে অপর মহিলা ও তার গর্ভের সন্তান নিহত হয়। নিহত মহিলার উত্তরাধিকারীগণ মহানবী (স)-এর নিকট বিচার প্রার্থী হলে তিনি হত্যাকারীনীর আকিলাকে গর্ভস্থ নিহত সন্তানের ক্ষেত্রে দাস বা দাসী মুক্ত করতে এবং নিহত মহিলার ক্ষেত্রে রক্ত মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দিলেন। [৩২]

বীমা ব্যবস্থায় অপরিহার্য বিষয় বিশেষ করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা প্রাচীন আরব থেকে আল-আকিলা পদ্ধতিতে সূত্রপাত ঘটে। রাসুল (স) পূর্বের প্রচলিত আকিলা প্রথাকে অনুমোদন করেছেন।

সাহাবায়ে কিরামের অনুশীলন ঃ আল-আকিলা মতবাদ ভিত্তিকই হল ইসলামী বীমা ব্যবস্থা। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা) ও অন্যান্য সাহাবাগণ আকিলা ব্যবস্থা অনুসরণ করেছেন। জনগণকেও আকিলার ব্যবস্থা অনুসরণে উৎসাহিত করেছেন।

---

[৩১] আল কুরআন, সূরা আল মায়েদাহ, আয়াত নং- ২

[৩২] ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামী ফাউন্ডেশন পৃ-

Dhaka University Institutional Repository

(২) সাদৃশ মূলক উৎস ঃ বীমা ব্যবস্থার ধারণা ও অনুশীলনকে আরো যৌক্তিক করতে ইজমা, কিয়াস ও ইস্তিহসান এর মত সাদৃশ্যমূলক উৎসগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। যতক্ষণ তা পবিত্র কুরআন ও মহানবী (স)-এর সুন্নাহ পরিপন্থী না হয়। প্রয়োজন বোধে সাদৃশ্য মূলক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করার পরামর্শ রাসূল (স) নিজেই দিয়েছেন।

ফিকহশাস্ত্র ও ইসলামী বীমা ঃ বীমা ব্যবস্থাকে বৈধ বলে ফিকহ শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে। ফিকহ আসসুন্নাহ নামক কিতাবে বীমার বৈধতা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। বীমা ব্যবস্থার সাধারণ মূলনীতির ভিত্তি হল আল আকদ, আল মুদারাবাহ আলওয়াকালাহ আল-শিরকাহ ইত্যাদি সম্পর্কে ও উক্ত কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লামা মুরগিনানির হেদায়া গ্রন্থেও অংশীদারিত্ব ওয়াকালা ইত্যাদি বীমা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যান্য ফিকহ শাস্ত্রের মধ্যেও বীমা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

দেশে বিদেশে আইন ও ইসলামী বীমা ঃ বর্তমান বিশ্বে শরীয়াহ ভিত্তিক অনেক বীমা কোম্পানী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মালয়েশিয়া, কাতার, ব্রুনাই, সুদান, সৌদিআরবসহ আরো কিছু দেশকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এসব ইসলামী বীমা কোম্পানী ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে এবং এসব দেশের পার্লামেন্ট কর্তৃক ইসলামী বীমা আইন অনুমোদিত। এ ব্যাপারে মালয়েশিয়া অনেক দূর এগিয়েছে। মালয়েশিয়া ইসলাম ভিত্তিক বীমা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন করেছে। দি তাকাফুল এ্যাক্ট (মালয়েশিয়া) ১৯৮৪ (এ্যাক্ট নং ৩১২)।[৩৩]

শরীয়াহ বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ঃ শরীয়াহ ভিত্তিক ইসলামী বীমা কোম্পানীতে শরীয়াহ উপদেষ্টা বোর্ড নামে একটি পরিষদ বা বোর্ড থাকে। এ শরীয়াহ বোর্ড কোম্পানীর সঠিক কার্যক্রম তদারকী করে এবং কোম্পানীকে ইসলামী বিধি বিধান পালনে বাধ্য করে। দি তাকাফুল এ্যাক্ট (মলয়েশিয়া) এর ৮(৫) অদ্যাদেশে উল্লেখ আছে, একটি শরীয়াহ সুপার – ভাইজারী কাউন্সিল কোম্পানীর কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবে। ১৯৯৪ সালের ১লা জুলাই প্রণীত সাধারণ তাকাফুল এ্যাক্ট এ ব্যাপারে লিখিত নির্দেশনা এবং কার্যপ্রণালী রয়েছে। সুদান সরকার রুলস অব দি শরীয়াহ সুপার ভাইজারী বোর্ড অনুমোদন করেছে। যা বীমা ব্যবসা ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধান করে।[৩৪]

---

[৩৩] ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল, ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, পৃঃ- ৪৯

[৩৪] ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা শীর্ষক প্রবন্ধ ২০০১, ড. মাসুম বিল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

ফকীহ্ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে বীমা

হানাফি মাযহাবের ফকিহ ইবনে আবেদীন বীমাকে শরীয়াহ বিধি-বিধান মতে পরিচালনা করা সম্ভব এবং বীমা ব্যবস্থা জায়েয। রাদ্দুল মুখতারে ইবনে আবেদীন বীমা সম্পর্কে বলেছেন-[৩৫]

وهذا انه جرت العادة ان التجارة اذا استاجروا مركبا من حربي يدفعون لـــه اجرتـــه ويدفعة وايضا مالا معلوما لرجل حربي مقيم في بلادة يسمي ذلك المال سوكرة علي انه مـهما هلك من المال الذي في المركب بحرق او غرق او نهب او غيره فذالك الرجل ضــــامن لـــه بمقابلة ما يأخذ منهم وله وكيل عنه.

متأمن في دارنا يقيم في البلاد السواحل الاسلامية بإذن السلطان يقبض مـــن التجار مال سوكرة واذا هلك من مالهم في البحر شئ يودي ذالك المتامن للتجار بدلة تماما

অথাৎ, এটি একটি প্রচলিত বিষয় যে, অমুসলিম দেশে ব্যবসায়ীগণ যদি কোন চার্টার বা অনুমতিপত্রের মাধ্যমে জাহাজ ক্রয় করে তবে পরিশোধিত মূল্যের সাথে সে দেশের চার্টার এর মালিককে অতিরিক্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। এ অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থকে সুকরা বা প্রিমিয়াম বলে। যদি আগুনে পুড়ে, ডুবে বা অন্য কোন দৈবিক দূর্বিপাকে জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায় তবে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণকারী চার্টারের মালিক জিম্মাদার হবে এবং সে এর ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে।

অনুরূপভাবে আমাদের দেশ তথা মুসলিম দেশের কোন জামিনদার বা জিম্মাদার সরকারের অনুমতি নিয়ে যে সকল জাহাজ উপকূলে অবস্থান করবে সে সব জাহাজ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুকরা বা প্রিমিয়াম গ্রহণ করবে। সমুদ্রে সেসব জাহাজ কোন দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে জাহাজের মালিক সংঘটিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ করবে।

মুফতি মোহাম্মদ আবদুহ বীমাকে বৈধ হিসেবে মত প্রকাশ করেছেন। ১৯০৬ সালে মিশরের গ্র্যান্ড মুফতী শেখ মুহাম্মদ বাকী বীমা সম্পর্কে ইবনে আবেদীনের মতকে গ্রহণ করেছেন।

---

[৩৫] রাদ্দুল মোখতার বাবুল মোস্তামিন ৩য় খন্ড, পৃ: ৩৪৫, The thesis a comparative analysis between common law and Islamic legal thought. P. 68

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ মুসা, আহমদ ইব্রাহীম, খান মুহাম্মদ ইউসুফ আহমেদ তাহা মানুসী আবদুর রহমান ইসা, আলী খালীফ, মোস্তফা জারকা ড. নেজাতুল্লাহ ছিদ্দিকীসহ আরো ইসলামী চিন্তাবিদগণ বীমা শরীয়াহ সম্মত বলে মত প্রকাশ করেছেন।[৩৬]

মাও: মওদুদী বীমা সম্পর্কে বলেছেন- বীমাকারীর মৃত্যুর পর তার জমাকৃত সমস্ত টাকা উত্তরাধিকারীদেরকে দেয়া হবে এবং শরীয়তের বিধি অনুযায়ী ত' সকল উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টন করা হবে। এ দুটো কথা যারা মেনে নিবে কেবল তাদেরই জীবন বীমা গ্রহণ করা হবে।[৩৭]

<u>ইসলামী বীমা সম্পর্কে ইসলামী গবেষকদের রচনা</u> ঃ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল মাহমুদ ইসলামী বীমা সম্পর্কে ১৯৪২ সালে একটি বই লিখেছেন- "আহকানুল উকুদ আমিন ওয়া মাকানিয়াহ মিন শরীয়াতীদ দ্বীন"। সাদ আবু জায়েদ ১৯৮৯ সালে লিখেছেন- "আত তামিন বাইনাল খাতরে ওয়াল ইবাহাত"। মোস্তফা আহমদ জারকা ১৯৮৪ সালে লিখেছেন- "নেজাম আত তামিন।" ড. মোসলেহ উদ্দিন "ইন্সুরেন্স এন্ড ইসলামিক ল" লিখেছেন ১৯৭৬ সালে। ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী "ইন্সুরেন্স ইন এন ইসলামিক ইকোনোমিকস" লিখেছেন ১৯৮৫ সালে। অধ্যাপক শামীর মানকাবাদী লিখেছেন- Insurance and Islamic Law, এর প্রকাশক Arab Law Quarterly- 1989. অমুসলিম হিসেবে বীমা বীমার উপর অধ্যাপক E Kling Muller লিখেছেন- The concept and development of Insurance in Islamic countries প্রকাশক Islamic culture 1969.[38] উল্লেখিত রচনাবলী পরবর্তী উচ্চ পর্যায়ের মুফতীদের বীমা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিতে প্রভাবিত করেছে। মুফতী মোহাম্মদ আব্দুহ অনেকবার বলেছেন বীমা পলিসি গ্রহণ করা জায়েয।[৩৯]

---

৩৬ Muslim Economic Thinking A survey of contemporary

৩৭ রাসায়েল মাসায়েল ৫ম খন্ড অনুবাদক আঃ শহীদ রাসিম, পৃ- ১৪৭

৩৮ The theyes Insurance with an analysis between common law and Islamic legal thought. Dr. Masum Billah, P-73.

৩৯ At tamim wa Mawataif at Shariah Al Islamic P- 74

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্ণৌ দারুল উলুমের নদওয়াতুল উলামা মাওঃ আবদুস সালাম নদভী বীমা প্রসঙ্গে বলেছেন- ম্যায় মাযহাবী আউর দুনয়াবী হায়সিয়াত সে বীমা কো বহুত ফায়দা বখশ তিজারত তাসাববর করতা হু। আউর হযরত মাওঃ মৌলভী মুহাম্মদ কিফায়াত উল্লাহ কী ফতোয়া সে ইত্তেফাক করতাহু। মুসলমানু সে পুরোজোর সুপারিশ করতা হুকি। ওহ ইস জমানে মেঁ কিসি হামছায়া কওম সে পিছে না রহেঁ।

অর্থাৎ আমি মাযহাবী ও পার্থিব উভয় দৃষ্টিকোন থেকে বীমা ব্যবসাকে অত্যান্ত উপকারী মনে করি এবং মাওঃ কেফায়াত উল্লাহর ফতোয়ার সাথে একমত পোষণ করি। মুসলমানের কাছে আমি জোড়ালো সুপারিশ করছি। তারা যেন এ যুগে কোন প্রতিবেশী জাতির চেয়ে পশ্চাদপদ না থাকে।

<u>মাওলানা কিফায়াতুল্লাহর ফতোয়া ঃ</u> আজকাল বীমা জিন্দেগী করণে কা রেওয়াজ ইয়েহ হ্যায় জিসকী সুরত ইয়েহ হ্যায় কী বীমা করনেওয়ালা কুছ রকম দেতা রহতা হ্যায়। আউর মুকাররার মুদ্দত আন্দর মর জায়ে তো মুকাররারা রকম উসকি ওয়ারেছো কো মিল জাতি হ্যায়। চাহে উসকি দাখিল কী হুয়ী রকম জেয়াদা হিহো, ইস সিসটমকে জারি করনেছে পাছমন্দেগানে মাইয়েত কী ফায়দা রছানী মকসুদ হ্যায় জো নিয়ত নেক হ্যায় সুদখোরী ইয়া সুদ খোরানী মকসুদ নেহী। বলকে পাছ মন্দেগান আউর ইয়াতামা কী খরবগীরী মাকসুদ হ্যায়। লিহাজা জায়েয হয়। কুরআন মজিদ মে আম উসুল বয়ান ফরমায়া হ্যায়। খোদ মাকসুদ আউর মুসলেহ কো খুব জানতা হ্যায়। হাদিস শরীফ মে হ্যায় আমল কা মুরাদ নিয়াত পর হায়। চুকি উসকাম মে নিয়ত পাক হ্যায় লিহাজা ইসকে জাওয়াজ নে কালাম নেহি।[৪১]

অর্থাৎ আজকাল জীবন বীমা করার নিয়ম হয়েছে যাতে বীমাকারী কিছু টাকা দিতে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে নির্ধারিত অংকের টাকা যা প্রদত্ত টাকার পরিমাণের চেয়ে বেশী হলেও মৃতের উত্তরাধিকারীকে দেয়া হয়। এ পদ্ধতি প্রয়োগে মৃতের উত্তরাধিকারী এবং অনাথের উপকার সাধনই মূল কথা, যা অত্যন্ত সৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। সুদ নেয়া বা সুদ দেয়ার লক্ষ্যে নয়। সুতরাং এটা জায়েয। কুরআন মজীদে সাধারণভাবে বর্ণিত আছে খোদা উদ্দেশ্য এবং মঙ্গল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ও ভাল জানেন। হাদীস

---

[৪১] অন্যান্য পেশা বীমা, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পৃ- ৩০

Dhaka University Institutional Repository

শরীফে উল্লেখ আছে উদ্দেশ্য বিচারে কর্মফল নির্ধারিত হয়। যেহেতু এ কাজ পবিত্র উদ্দেশ্যে করা হয়। তাই তা জায়েয হওয়াতে কোন আপত্তি নেই।

হাটহাজারী ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রাচীন শাহী মসজিদের ইমাম মাও ইসহাক সাহেব এর মতে- আলামা কিফায়াতুল্লাহ (র)-এর ফতোয়া সঠিক ও নিঃসন্দেহে শরীয়ত সম্মত।

দেওবন্দের মাওঃ মুহাম্মদ মুসলিম উসমানী বীমা সম্পর্কে বলেছেন- ইনস্যুরেন্স কি দুনিয়াবী হ্যায়াসিয়াত কীয়া হ্যায়, ইসকে মুতায়াল্লিক কভী যেয়াদা মুতালিয়া করনেকা ইত্তেফাক তো নেহী হুয়া হ্যায়। আলবত্তা গহ্-ব-গহ্ রিসালা ''সুদমন্দ''-কে মাজামিন পড়নেছে মালুম হুয়া হ্যায় কি বীমা এক বহুত আচ্ছি চীজ হ্যায় আগার চেহ মুসলমান আভি ইসমে বহুৎ পিছে রহে হ্যায়। নতীজা ইয়ে হোতা হ্যায় কি জবদুসরী কাওম ইসতেহারিক মে খুব উরুজ হ্যায় ফির মুসলমান আ-গে বড় নেহী কোশিশ করতে হ্যায়। য়েহী হাল ইনস্যুরেন্স কি মুতায়াল্লিক মুসলমানুকা হোশ আতা হ্যায় কি মুসলমান আখেঁ খোলে আউর ইনসুরেন্স জায়হে মুফীদ তেহরিক বহায় সিয়াৎ আজ-মোই দাখিল হো।[৪১]

অর্থাৎ বীমার পার্থিব প্রয়োজন সম্পর্কে কখনও খুব বেশী পড়ালেখা করার সুযোগ না হলেও সুদ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনাগুলো পড়তে গিয়ে জেনেছি যে, বীমা একটি খুব ভাল জিনিষ যদিও মুসলমানরা এখনো এ ব্যাপারে অনেক পশ্চাদপদে রয়েছে। এর ফলাফল হচ্ছে যে, অন্যান্য জাতি যখন এ থেকে প্রচুর সুফল আদায় করে নিতে ব্যস্ত তখনই মুসলমানদের চৈতন্য হয় এবং এ সুযোগের জন্য এগোতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। বীমার ব্যাপার তো মুসলমানদের এ অবস্থা। এখনো সময় আছে, মুসলমানদের চোখ খুলে বীমার মত একটি সুবিধাজনক ব্যবস্থা থেকে সুযোগ গ্রহণের জন্য উঠে পড়ে লাগা উচিত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল গফুর চৌধুরী মুমতাজুল মুহাদ্দেসীন নির্দ্বিধায় উপরোক্ত ফতোয়ার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

ইসলামী বিধানের আলোকে বীমার স্থান নির্ণয় কোন মুসলমানের সংশয়ের অবকাশ নেই। সঞ্চয়, পরিজনের জন্য ব্যয় উত্তরাধিকারীদের জন্য ব্যবস্থা, আপৎকালের ব্যবস্থা ও দানই হল ইসলামী বীমা। ইসলামী বিধি বিধানের সাথে সম্পূর্ণরূপে সংগতিশীল।

---

[৪২] অনন্য পেশা জীবন বীমা, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, পৃঃ ৩১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমার উপর সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম

ইসলামী বীমার উপর বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী দেশে অসংখ্য সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর কয়েকটি হল নিম্নরূপ-

ইসলামী ফিকহ সপ্তাহ দামেস্ক অনুষ্ঠিত হয়- ১-৬ এপ্রিল ১৯৬১। বীমা ব্যবসার বৈধতা নিয়ে মরক্কো সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে ৬ মে, ১৯৭২ সালে। কায়রো সম্মেলন ১৯৬৫। লিবিয়াতে ইসলামী আইনের উপর সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয় ৬-১১ মে ১৯৭২। বীমার উপর মক্কাতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২১-২৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬। দুবাইতে ইসলামী বীমার উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১১ নভেম্বর ১৯৯৬। মালয়েশিয়ার লাবুয়ানে তাকাফুলের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে ১৯-২০ জুন ১৯৯৭।

ইসলামী বীমার উপর সংসদীয় আইন

বীমা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। ইসলামী বীমা ইসলামী অর্থনীতির একটি বিশেষ অংশ। বর্তমান বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতি একটি চ্যালেঞ্জিং অবস্থানে পৌঁছেছে। এর মূলে কার্যকরী ভূমিকা রেখে চলছে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ইসলামী শ্রমনীতি। আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং এর সফল অগ্রগতিকে বিবেচনা করে বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এ ইসলামী বীমার ইতিহাস দু যুগ অতিবাহিত না হতেই অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য অনেক বীমা প্রতিষ্ঠানকে ছাড়িয়ে লাভ জনক প্রতিষ্ঠানে রূপায়িত হয়েছে। এর অগ্রগতির পেছনে কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে দেশীয় সংসদীয় আইন প্রণয়ন। বিশ্বে বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী বীমা অধ্যাদেশ সংসদে পাশ হয়েছে। যেমন মালয়েশিয়া, সুদান, ব্রুনাই, কাতার এবং সৌদিআরব। তবে মালয়েশিয়ার ইসলামী বীমা অধ্যাদেশটি উল্লেখযোগ্য। মালয়েশিয়ার পার্লামেন্ট ১৯৮৪ সালে সে দেশের ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে পাশ করে The Takaful Act (Malaysea) 1984 (Act 312) [৪০]

---

৪০ The thesis Insurance with a comparative analysis between common law and Islamic legal thought. Dr. Masum Billah P- 414

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে শ্রমনীতি

আধুনিক বিশ্বে ইসলামী অর্থনীতির অগ্রযাত্রার মূলে রয়েছে ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়ন। তাই ইসলামে শ্রমনীতি সম্পর্কে সাধারণ কিছু আলোচনা নিম্নরূপ-

শ্রম ও শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে ইসলামী বিধান ঃ কর্মবিমুখতাকে ইসলাম স্বীকার করে না। আল্লাহ মানুষ থেকে তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব নিবেন। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে কাজ করা বা কাজ না করা, অর্থ উপার্জন করা বা বেকার থেকে মৃত্যুবরণ করা এ দুপ্রকার অধিকারই ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে কাজ না করে বেকার থেকে মৃত্যুবরণ করার অধিকার ব্যক্তিকে দেয়া হয় নাই। এখানেই ইসলামী অর্থনীতি ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির মৌলিক পার্থক্য। যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন না আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন। আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন-

ان الله يكره ان يري عليه عبده فارغا من عمل الدنيا والاخرة.[৪৩]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতের কাজে বিমুখ আল্লাহ তাকে নিশ্চিত ভাবে ঘৃণা করেন।

ইসলামে শ্রমকে গুরুত্ব দিচ্ছে বলে যথেচ্ছাশ্রম ব্যবহারের অধিকার এবং যে কোন পেশা অবলম্বনের অধিকার ইসলাম স্বীকার করে না। শ্রম-ব্যবহারের একক দায়িত্ব কোন ব্যক্তির নয়। ব্যক্তি বুদ্ধি ও প্রচেষ্টার দ্বারা স্বাধীন পেশা অবলম্বনের চেষ্টা করবে। আর ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত কাজের সুযোগ দেয়ার দায়িত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের। ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করবে এমন কোন ধারণা ইসলামে নেই। বেকারত্ব ইসলামী জীবনাদর্শে মহাপাপ। এ পাপের শাস্তি যে শুধু বেকার ব্যক্তিই পাবে তা নয়, সমাজও এ পাপের জন্য আল্লাহর নিকট দায়ী হবে। বেকারত্ব দূর করে ব্যক্তিকে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া সমাজ বা রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় কর্ণধারের মহত্ব বা করুণা নয়; বরং তা তার উপর ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। ব্যক্তি এ সুযোগ গ্রহণ করবে অনুকম্পা নয়; বরং ন্যায্য অধিকার হিসেবে।

পূর্ণ নিয়োগ ব্যবস্থা অর্থাৎ সকল মানুষের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য। সরকারের সাহায্য ছাড়া যদি কেউ কর্মসংস্থানের সুযোগ পায় তাহলে তাতে সরকার

---

[৪৩] মিশকাত শরীফ, পৃ- ১৮০

Dhaka University Institutional Repository

হস্তক্ষেপ করবে না। ব্যক্তি যখন নিজ চেষ্টায় কর্মসংস্থানে অপারগ তখনই রাষ্ট্র অবশ্য কর্তব্য হিসেবে ব্যক্তি কর্ম স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে। ব্যক্তিকে কাজের সুযোগ করে দেয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং ব্যক্তিকে কি কাজে নিয়োগ করা হবে তা নির্ধারণের অধিকার ও রাষ্ট্রের। ব্যক্তির জীবিকা সংস্থানের ব্যবস্থা করা যে সরকারের উপর কত বড় দায়িত্ব তা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা)-এর বক্তব্য থেকে বুঝা যায়। তিনি বলেন- ফোরাতের তীরে একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায় তার জন্য খলিফা ওমরকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে।[৪৪]

রাষ্ট্রপতি হযরত ওমর (রা)-এর এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় নাগরিকদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে দায়িত্ব সরকারের। এ বিষয়টি সামনে রেখে আমরা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং ইসলামী অর্থনীতির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য দেখতে পাই।

ইসলাম অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিকসহ সকল প্রকার যুলুম, নির্যাতনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যে কোন পদ্ধতিতে হোক অর্থনৈতিক শোষণ ইসলামে নিষিদ্ধ। একজন কাজ করলে সম্পদের উপযোগিতা বাড়বে, অন্যজন শোষণ মূলক সামাজিক আইন ব্যবস্থার অনুমোদনে উদ্বৃত্ত মূল্যের অংশ ভোগ করবে এ ব্যবস্থা ইসলাম স্বীকার করে না। সকলেই তার শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী ভোগাধিকার পাবে। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন- وان ليس للانسان الا ما سعى।[৪৫] অর্থাৎ, এমন কিছুতে মানুষের অধিকার থাকবে না যে সে নিজে চেষ্টা করে উপার্জন করেনি।

মানুষ যতটুকু চেষ্টা করবে ততটুকু পাবে, তার অধিক নয়। একজনের পরিশ্রমের ফল অন্যজন ভোগ করতে পারে না। ইসলামী অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত মূল্য (Suplus Value) সৃষ্টির কোন সুযোগ নেই। যে সমাজ ব্যবস্থায় কর্ম বিমুখতার অধিকার স্বীকৃত সে সমাজ ব্যবস্থায় উদ্বৃত মূল্য সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাতে এক শ্রেণীর উৎপাদন দ্বারা অন্য শ্রেণী লাভবান হয়।

শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদন বা গড় উৎপাদন থেকে কম মজুরী দেয়া ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। শ্রমিকের শ্রমের ফলের এক বিশেষ অংশই ভোগ করেন শিল্পপতিরা। এটা উল্লেখিত আল কুরআনের আয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত।

---

৪৪ ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, এ.জেড.এম. শামসুল আলম পৃ- ৮১

৪৫ আল কুরআন সূরা নজম, আয়াত নং- ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জন সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন-

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة[৪৬]

অর্থাৎ, সৎ উপায়ে জীবিকা উপার্জন মৌলিক দায়িত্ব (ঈমান) আদায়ের পর অবশ্যকরণীয়।

রাসূল (স)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবিকা অর্জন করা ফরয বা অবশ্যকরণীয়। কর্তব্য পালন ব্যক্তির খেয়াল খুশির উপর নির্ভর করে না। কর্তব্য পালনে অবহেলা করার অধিকার কারো নাই।

উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎকারী পরনির্ভরশীল ব্যক্তি প্রত্যেক সমাজেই কম বেশী থেকে থাকে। কিছু সংখ্যক লোক কাজ না করে অপরকে শোষণ করার সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। ইসলামী অর্থনীতিতে এমন শ্রেণীর স্থান নেই। প্রত্যেককে কাজ করে খেতে হবে। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার মত শোষণের কোন সুযোগ নেই।

ইসলামের প্রথম পর্যায়ে বর্তমানকালের ন্যায় ধর্ম ব্যবসায়ী পুরোহিত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। রাসূল (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে খৃষ্টধর্মে স্বতন্ত্র যাজক শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল। এরা সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর রোজগারের উপর নির্ভর করত। এদের সম্পর্কে কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে-

يايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليـــاكلون امـــوال النـــاس بالبـــاطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في ســـبيل الله فبشـــرهم بعذاب اليم.[٤٧] ৪৭/৪৭

অর্থাৎ, হে বিশ্ববাসীগণ! পন্ডিত ও সংসার বিরাগী অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের বিরত রাখছে। আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদের কঠোর আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।

এ আয়াতে অপরের সম্পদে ধর্মে-কর্মে লিপ্ত সাধকদের অধিকার সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে।

---

৪৬ মেশকাত শরীফ, বাবু আল-কাসবু ওয়া তালবুল হালাল, আরবী সংস্করণ, পৃ- ২৪২

৪৭ আল কুরআন, সূরা তাওবা, আয়াত নং- ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

সদুপায়ে জীবিকা উপার্জন এবং ধর্মীয় প্রার্থনাকে রাসূল (স) সমমর্যাদা দিয়েছেন। একদিন রাসূল (স) কয়েকজন সাহাবা নিয়ে বসেছিলেন। তারা এক যুবককে অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে তাদের দিকে আসতে দেখল। সাহাবীগণের মধ্যে কেউ কেউ মনে করলেন যুবকটি হযরত রাসূল (স)-এর কথা শুনতে রাসূল (স)-এর নিকট আসতেছে। কিন্তু দেখাগেল যুবকটি রাসূল (স) এবং সাহাবাদেরকে পাশকাটিয়ে চলে যাচ্ছে। জনৈক সাহাবী মন্তব্য করলেন, যদি যুবকটি এমনি আনন্দচিত্তে ধর্মকাজে যোগদিত তবে কতইনা ভাল হত! রাসূল (স) বললেন, এ যুবকটি যদি অভাব দূরীকরণের জন্য তার সন্তান বা পিতা-মাতার ভরণ পোষণের জন্যে, জীবিকার জন্য, পরনির্ভরশীলতা থেকে বাঁচার জন্য, কর্মে গমন করে থাকে, তবে নিশ্চয়ই সে, আল্লাহর পথে আছে। কিন্তু সুনামের জন্যে হলে নয়। সৎ জীবিকা উপার্জনকে ইসলাম দিয়েছে জিহাদের সমান গুরুত্ব এবং সৎভাবে জীবিকা উপার্জনকারী ও গাযীকে দিয়েছে সমান মর্যাদা। [৪৮]

অন্য হাদীসে রাসূল (স) ঘোষণা করেছেন-

عن ابي سعيد (رضـــ) قال قال رسول الله (صـــ) التاجر الصدوق الامين مع النبيـــن والصديقين والشهداء. [৪৯]

অর্থাৎ, সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দিক ও শহীদগণের সাথে পরকালে অবস্থান করবে।

রাসূল (স) আরো বলেছেন শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু। [৫০] মুতরাফিনদের জন্যে ইসলামে শাস্তির বিধান রয়েছে। যারা অন্যের শ্রমের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করে কোন কাজকর্ম না করে শুধু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ভোগ করে বেড়ায় তাদেরকে মুতরাফিন বলা হয়। মুতরাফিনদের স্থান ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নেই। তাদের জীবন যাত্রার উপর আল্লাহ অনিহা প্রকাশ করে থাকেন। কুরআন তাদেরকে আদ, সামুদ ও ফেরাউন এর পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। [৫১]

ইসলামে উত্তরাধিকারকে প্রাধান্য দিলেও আল্লাহর দেয়া আমানত এ মানব জীবনকে কখনও অলসভাবে কাটাবার অধিকার দেয়নি। যে সমস্ত মুতরাফিন প্রচুর বিত্ত সম্পদের

---

৪৮ মেশকাত শরীফ, পৃ-

৪৯ মিশকাতুল মাসাবিহ, আরবী সংস্করণ পৃ- ২৪৩

৫০ মুসনাদে আহমদ, পৃ-

৫১ ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, এ. জেড. এম শামসুল আলম পৃঃ- ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরাধিকার সূত্রে মালিক হয়ে কর্ম বিমুখ অলস জীবন যাপন করে তারাই সমাজ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হয়ে থাকে।

উত্তরাধিকার নীতিকে কোন কোন আদর্শবাদী দল প্রগতি বিরোধী বলে অপব্যাখ্যা করে থাকে। তাদের ধারণা উত্তরাধিকার যে সমাজ গ্রহণ করে থাকে সে সমাজ প্রগতি পরিপন্থী সমাজ। যারা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ পেয়ে থাকেন সমাজ ও সভ্যতায় তাদের দান কম। যে সমাজ উত্তরাধিকারকে স্বীকৃত দেয়া হয় না সে সমাজে প্রত্যেকেই জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করবে। সুতরাং সমষ্টিগত শ্রম হবে বেশী। এরূপ যুক্তিতে আংশিক সততা থাকলেও অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অবহেলা করা হয়।

উত্তরাধিকার না থাকলে ব্যক্তি তার সমস্ত প্রতিভা ও শক্তি ব্যবহারে উৎসাহ ও উদ্যোগ হারিয়ে ফেলবে। স্বীয় জীবনকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করার জন্য যতটুকু পরিশ্রম করা দরকার তার অধিক করার প্রবণতা থাকবে না। তাই ইসলাম উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে বটে কিন্তু রক্ষাকবচের ও ব্যবস্থা করেছে। যাতে তা প্রগতি পরিপন্থী না হতে পারে। কর্মবিমুখ পর শ্রমজীবিদের সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন-

من اعطي الذلة من نفسه طائعا غير مكره فليس منا[৫২]

অর্থাৎ, যে ইচ্ছা করে বিনা কারণে নিজের উপর দু:খ দুর্দশা টেনে আনে (অলসতা ও উদাসীনতা বশত: রোজগার না করে) সে আমার অনুগামী নয়।

পরশ্রমজীবি শ্রেণী সম্পর্কে আব্দুল কাদের জিলানী (র) বলেছেন- হালাল উপার্জন রাসুল (স)-এর সুন্নাত। যতদিন তুমি পরশ্রমজীবি থাকবে ততদিন পর্যন্ত তুমি আল্লাহর সৃষ্টিকে তার সাথে অংশীদার বা শরিক করলে এবং তোমাকে ঐ উপার্জনের জন্য শাস্তি দেয়া হবে।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স) নিজে শ্রমকে পছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন- খাটি মুসলমান ললাটে ঘর্ম নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে। [৫৩]

রাসুল (স) নিজে এবং তার আদর্শে অনুপ্রাণিত সাহাবাগণ শ্রমজীবি ছিলেন। নিম্নোক্ত হাদীসে রাসুল (স) দ্বারা রাসুল (স) শ্রমজীবির প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন-

---

৫২ فترح الغيوب (المقالة العصيان عشر)

৫৩ মিশকাত শরীফ

Dhaka University Institutional Repository

لان يأخذ احدكم حبله فياتي بجزمه حطب علي ظهره فيبعها خير له مـــن ان يســـال الناس [৫৪/০৫]

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ অপর কারো নিকট কিছু চাওয়ার চেয়ে পৃষ্ঠে কাঠের বোঝা বহন করে তা বিক্রি করা অধিকতর মর্যাদার কাজ।

রাসূল (স) মুসলমানদিগকে আত্মনির্ভরশীল হতে এবং শ্রমাদর্শে উদ্দীপ্ত হতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেছেন আল্লাহ এমন বান্দাকে ভালবাসেন যে স্বীয় উপার্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করে। [৫৫]

রাসূল (স) আরো বর্ণনা করেছেন-

ايما رجل كسب ما لا من حلال فاطعم نفسه او كساها فمن دونه من خلق الله فان لـــه به زكواة [৫৬/০৬]

অর্থাৎ, ভাত কাপড়ের ব্যবস্থার জন্য বা আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে অন্য কারো উপকারার্থে যে শ্রমিক দিবাবসান পর্যন্ত কাজ করে সে তার স্বাস্থ্যের যাকাত আদায় করে।

রাসূল (স) হতে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে-

عن المقدام بن معديكرب عن رسول الله (ص) قال ما كسب الرجل كسبا اطيب مـــن عمل يده وما انفق الرجل علي نفسه واهله وولده وخادمه فهو صدقة. [৫৭/০৭]

অর্থাৎ, হযরত মেকদাম বিন মাদীকারাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন- কোন ব্যক্তির নিজ হাতে উপার্জন করার চেয়ে অধিক পবিত্র উপার্জন আর নাই এবং কোন ব্যক্তি নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য, তাঁর সন্তানের জন্য এবং তাঁর খাদেমের জন্য যা ব্যয় করে তা সদকাহ।

শ্রমিকের স্থান ইসলামী সমাজে উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন। যে শ্রমিককে আল্লাহর বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়েছেন সে অবহেলিত বা নিন্দনীয় নয়। তাই ইসলামে এক উন্নত শ্রমনীতি উপহার দিয়েছে।

---

[৫৪] মিশকাত শরীফ, আরবি সংস্করণ পৃ- ১২২

[৫৫] তিবরানী

[৫৬] মিশকাত শরীফ

[৫৭] ইবনে মাজাহ, আরবি সংস্করণ পৃ- ১৫৬

ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার

ইসলাম যেমনভাবে শ্রমাদর্শকে উৎসাহিত করে তেমনভাবে শ্রমিকের ন্যায্য অধিকার আদায়কেও বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমিকদেরকে শোষণের পরিবর্তে শান্তির বাণী শুনিয়েছেন। রাসূল (স) হাদীস শরীফে ঘোষণা করেছেন- শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকাবার পূর্বেই তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। ইসলাম মালিক-শ্রমিক, ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। সকল মুসলমান ভাই ভাই। ইসলামে আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি কেবলমাত্র তাকওয়া বা খোদাভীতি। শ্রমিক নিজের সন্তান-সন্ততির, পিতা-মাতা ও পরিবার-পরিজনের দুমুঠো ভাত জোগাড় করার জন্য দিন রাত, সকাল-সন্ধ্যা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে থাকে। অনেকে অর্থের অভাবে বিয়েও করতে পারে না। এ সকল নিপীড়িত, নির্যাতিত শ্রমজীবি মানুষদের উপযুক্ত মর্যাদা ন্যায্য অধিকার এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিয়েছে ইসলাম। রাসূল (স) ঘোষণা করেছেন শ্রমিক অবিবাহিত হলে বিয়ে করার ব্যবস্থা করবে। খাদেম না থাকলে খাদেম রাখার ব্যবস্থা করবে। বাসস্থান না থাকলে বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। তিনি অন্য হাদীসে উল্লেখ করেছেন-

هم اخوكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن جعل اخاه تحت يده فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس و لا يكلفه من العمل نعليه فليعنه عليه.

অর্থাৎ, তারা (শ্রমিকরা) তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তার ভাইকে অধীনে রাখবে সে (মালিক) যা খাবে শ্রমিককেও তাই খাওয়াবে, সে (মালিক) যে মানের কাপড় পরিধান করবে তাকেও সে মানের কাপড় পড়তে দিবে। যে কাজ নিজের জন্য কষ্ট মনে করবে সে কাজ করার জন্য তাকে বাধ্য করবে না। সে কাজ তাকে করালে প্রয়োজন পরিমাণ সাহায্য করবে।

বুখারী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর মানুষের সাথে আমার ঝগড়া হবে। তারা হচ্ছে- ১. যে আমার নামে কসম খেয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পরে তা ভঙ্গ করে। ২. যে কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে বিক্রি করে অর্থ ভোগ করে। ৩. যে কোন শ্রমিক নিয়োগ করে সম্পূর্ণ কাজ আদায় করে নেয় অথচ তাকে ন্যায্য অধিকার দেয় না। [৫৮]

---

[৫৮] মিশকাত শরীফ (আরবী সংস্করণ) বাবুল ইজারাহ পৃ- ২৫৭

উপরোক্ত হাদীসগুলো বিশ্লেষণ করলে শ্রমনীতির যে মূলনীতিগুলো বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ-

১। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভাই ভাই সম্পর্ক হবে।

২। মালিক যা খাবে, যা পরিধান করবে এবং যেরূপ বাসস্থানে থাকবে শ্রমিকের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা করবে বা সে পরিমাণ ভাতা দিবে। হাদীসে উল্লেখ আছে-

عن انس بن مالك ان رسول الله (ص) قال لا يومن احدكم حتي يحب لاخيه او قـــال لجاره ما يحب لنفسه.[৫৭] ৫৭/০৭

অর্থাৎ, হযরত আনাস বিন মালেক (রা) হতে বর্ণিত রাসুল (স) বলেছেন, তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না নিজের পছন্দনীয় বিষয় অন্য ভাই বা প্রতিবেশীর জন্য পছন্দ করে।

৩। দারিদ্র ও বেকারত্বকে ইসলাম স্বীকার করে না।

৪। শ্রমিককে স্বীয় ইচ্ছামত পরিশ্রমিক দেয়া যাবে না। ন্যায় বিচার ও ইনসাফের ভিত্তিতে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে।

৫। শ্রমিককে সাধ্যের অধিক কাজের বোঝা চাপানো যাবে না।

৬। শ্রমিক অর্থের অভাবে বিয়ে করতে না পারলে বিয়ের প্রয়োজনীয় খরচ প্রদান করবে।

৭। শ্রমিকের সাংসারিক কাজের জন্য খাদেম প্রয়োজন হলে খাদেম রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ভাতা দিবে।

৮। শ্রমিক অসুস্থ হলে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

৯। নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত শ্রম নেয়া হলে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিবে।

১০। কাজের দায়িত্ব, প্রকৃতি, কাজের সুযোগ-সুবিধা, কাজের সময়, পেশাগত অভিজ্ঞতা শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক মর্যাদা, পারিবারিক জনসংখ্যা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করেই শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হবে।

ইসলাম শ্রমিকের এমন এক মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে যা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি বা অন্য কোন মতাদর্শ দিতে পারে নাই।

---

[৫৭] ইবনে মাজাহ, ঈমান অধ্যায়।

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ শ্রমিকের গুণাবলি

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমিকদের মর্যাদা ও অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী শ্রমনীতি অনুযায়ী শ্রমিকদেরকেও আদর্শিক গুণে গুণান্বিত হতে হবে।

নিম্নলিখিত গুণাবলী সম্পন্ন শ্রমিকই হল একজন আদর্শ শ্রমিক।

১। শ্রমিকদের কথাবার্তা, চাল-চলন, আচার ব্যবহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদে সুচারু ও ইসলামী অনুশাসন ভিত্তিক হতে হবে।

২। প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য চাকুরীজীবি, গ্রাহকসহ সকলের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে।

৩। নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজে সৎ, নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক হতে হবে।

৪। যথাসময়ে নামাজ কায়েম করতে হবে।

৫। কর্মকর্তা-কর্মচারী ভ্রাতৃত্ব বোধের ভিত্তিতে সাধ্যানুযায়ী একে অন্যের সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে।

৬। নিম্ন পদস্থদের সাথে খারাপ আচরণ না করে ভাই হিসেবে বিপদ আপদে সাহায্য করতে হবে।

৭। নিয়মিত কুরআন, হাদীস ও ধর্মীয় বই অধ্যয়নের মাধ্যমে নিজেদেরকে ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবে এবং সে অনুযায়ী আমল করবে।

৮। পরস্পরের মাঝে ইসলামী দাওয়াতের কাজ চালু রাখা এবং ইসলামী পদ্ধতিতে সঞ্চয়ে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবে।

৯। শ্রমিকগণ নিজেদেরকে একজন চাকুরীজীবি মনে না করে সুদ ও শোষণমুক্ত ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একজন সৈনিক হিসেবে নিজেকে বিবেচনা করে কাজ করবে।

১০। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সুদ ও ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে।

১১। হালাল ও হারামকে সামনে রেখে সকল কাজ সমাধান করতে হবে।

১২। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ প্রাথমিক পর্যায়ে সহযোগিতামূলক ব্যবস্থপনা থাকলেও আজকের মত সুশৃঙ্খল নীতিমালা ভিত্তিক কোন বীমা শিল্প ছিল না। পূর্বের সহযোগিতামূলক ব্যবস্থাপনার ধারণা থেকেই আজকের বীমা শিল্প। সর্বপ্রথম মুসলিম আইনজ্ঞদের মধ্যে হানাফী ফিকহবিদ ইবনে আবদীন (১৭৮৪-১৮৩৬ সাল) ইন্সিওরেন্সকে জায়েয বলে ফতোয়া দেন। তিনি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ইন্সিওরেন্সকে জায়েয বলে মতামত দিয়েছে।[৬০]

ইবনে আবেদীন বলেছেন যে, অনেক মুসলিম আছেন যারা ইন্সিওরেন্সকে শরীয়তে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। তিনি তাদেরকে ইসলামিক দৃষ্টিকোন বজায় রেখে বীমা ব্যবসা গ্রহণ করতে মত দিয়েছেন। তারপর থেকেই মুসলিম মনিষিগণ ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ইন্সিওরেন্সকে বিবেচনা করতে শুরু করেছেন। দার্শনিক মুলার ধারণা করেন, মুসলমানরা শুধুমাত্র বিদেশী কোম্পানীগুলো থেকে ক্রয়ের মাধ্যমেই বীমা ব্যবসায় জড়িত হয় নাই। বরং নিজেরাও কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে নিজেদেরকে বীমাকারকে পরিণত করেছে।[৬১]

বিংশ শতাব্দিতে ইসলামিক ইন্সিওরেন্স

ইসলামিক জুড়ি মোহাম্মদ আব্দুহ ১৯০০ সাল ও ১৯০১ সালে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বীমা শিল্প গ্রহণযোগ্য হতে পারে বলে দুটি ফতোয়াজারি করেন। এ বীমা হবে মোদারাবা পদ্ধতিতে। বিংশ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছে মসুলিম ও অমুসলিম দেশে ইসলাম ভিত্তিক বীমা চর্চা। এ শতাব্দিতে অনেক ইসলামী বিশেষজ্ঞ বীমা নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। তন্মধ্যে ড. নেজাতুল্লাহ, ড. মোছলেহ উদ্দিন ও ড. মাসুম বিল্লাহ অন্যতম। এরা বীমা কর্মপদ্ধতিকে ইসলামভিত্তিক রূপদানে সক্ষম হয়েছেন। সমসাময়িক ইসলামী বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের ধারণা হচ্ছে ইসলামী বীমা শরীয়া আইনের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। এ নিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

- ইসলামী ফিকহ কনফারেন্স দামেস্ক- ১৯৬১।

---

৬০ Klingmuller E. The concept and Development of Insurance in Islamic countries in Islamic culture vol, XLIII. 1969, P. 30

৬১ A comparative analysis between common law and Islamic legal thought. Dr. Masum Billah 1998, chapter [P-2]

Dhaka University Institutional Repository

- সেকেন্ড কনফারেন্স অব মুসলিম উলামা কায়রো- ১৯৬৫।
- সিম্পোজিয়াম অব ইসলামী জুরিস প্রুডেন্স লিবিয়া- ১৯৭২।
- ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ইসলামিক ইকোনমিক্স, মক্কা ১৯৭৬।
- কাউন্সিল অব সৌদি উলামা রেজুলিউশন ১৯৭৭।
- ফিকহ কাউন্সিল অব মুসলিম ওয়ার্ল্ডলীগ রেজলিউশন, ১৯৭৮।[৬২]

ফলশ্রুতিতে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক সুদানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে সুদানে প্রথম ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। সুদানিজ এ্যাক্ট ১৯২৫ এর আওতায় এটি প্রতিষ্ঠিত হয় যার সচিবালয় হল খার্তুমে। সুদান ইসলামী ইন্সুরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে ফয়সল ব্যাংক অব সুদান। এর অনুমোদিত মুলধন ছিল দশ লক্ষ সুদানী পাউন্ড।[৬৩] সুদানী ইসলামী ইন্সুরেন্সকে সুদান সরকার বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে। যেমন এ কোম্পানী সম্পদ ও মুনাফা আয়কর মুক্ত এবং এর পরিচালনা বোর্ড এবং শরীয়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের সদস্যগণও আয়কর মুক্ত।[৬৪] ইসলামী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অব সুদান এর শাখা স্থাপন করেছে সৌদি আরবে। ইসলামী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সুদান এর ১৯৮০ সালে প্রিমিয়াম কালেকশন ছিল ১৭২২৯০৫ সুদানী পাউন্ড। এ কোম্পানী প্রতিষ্ঠার বছর এর মুনাফা ছিল ৫% হারে এবং ১৯৮০ সালে মুনাফা এ কোম্পানী মুনাফা দিয়েছে ৮% হারে।[৬৫]

<u>এরাব ইন্সিওরেন্স কোম্পানী দুবাই</u> ঃ ফয়সল ব্যাংক অব সুদানের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে একই বছর (১৯৭৯) দুবাই ইসলামী ব্যাংক দুবাইতে "এরাব ইসলামী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী" প্রতিষ্ঠা করে। দুবাই ইসলামী ব্যাংকের সমস্ত ব্যবসা এরাব ইসলামী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীকে দেয়া হয়।

<u>ইসলামী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী বাহরাইন</u> ঃ ব্যাংক অব সুদান ও দুবাই ইসলামী ব্যাংকে অনুসরণ করে বাহরাইনের আল বারাকা ব্যাংক ১৯৮০ সালে বাহরাইনে ইসলামী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়াও বাহরাইনে নতুন ইসলামী ইন্সিওরেন্স প্রতিষ্ঠিত

---

৬২ প্রবন্ধ ইসলামী জীবন বীমা, কাজী মোঃ মোরতুজা আলী পৃঃ- ৫০

৬৩ ইসলাম ইন্সুরেন্স (তাকাফুল) এ জেড এম শামসুল আলম, পৃঃ- ১৩৫

৬৪ ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল, ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, পৃঃ- ২৩

৬৫ ইসলাম ইন্সুরেন্স (তাকাফুল) এ জেড এম শামসুল আলম, পৃঃ- ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

হয়। যার মধ্যে জেনেভা ভিত্তিক দার আল মাল আল ইসলামী গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ''দি তাকাফুল ইসলামী ইন্সিউরেন্স কোম্পানী অব বাহরাইন' খুব ভাল ব্যবসা করেছে। এ কোম্পানীতে ১৯৯৫ সালে জেনারেল ইন্সিওরেন্সে প্রিমিয়াম আদায় হয়েছে ৩০ লক্ষ ইউ এস ডলার। জীবন-বীমা প্রিমিয়াম আদায় হয়েছিল ৫৮ লক্ষ ইউএস ডলার।[৬৬]

মালয়েশিয়া তাকাফুল (বীমা কোম্পানী) ঃ মুসলিম বিশ্বে মালয়েশিয়া সবচেয়ে ধনী দেশ না হলেও সার্বিক বিবেচনায় মালয়েশিয়া মুসলিম বিশ্বে সবচেয়ে অগ্রগামী দেশ হিসেবে ধরা হয়ে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকিং আইন ১৯৮৩ সালে পাশ করে মালয়েশিয়ায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৪ সালে মালয়েশিয়ায় তাকাফুল আইন পাশ করে। সেবছরই ২৯শে নভেম্বর শিয়ারিকাত (কোম্পানী) তাকাফুল (বীমা) মালয়েশিয়া সেন্ডিরিয়ান বারহাদ (লিমিটেড) অর্থাৎ মালয়েশিয়া ইসলামী বীমা কোম্পানী লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালের ১লা আগস্ট দশ কোটি মালয় ডলার মূলধন নিয়ে মালয়েশিয়া বীমা কোম্পানী লিমিটেড কার্যক্রম শুরু করে।

মালয়েশিয়ার তাকাফুল কোম্পানীর দুটি প্রধান বিভাগ আছে। (ক) জীবন-বীমা বিভাগ (খ) সাধারণ বীমা বিভাগ। মালয়েশিয়ার বীমা (তাকাফুল) কোম্পানীর অগ্রগতি সমৃদ্ধি ও অন্যান্য বীমা কোম্পানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৯১-১৯৯৫ এর মধ্যে কোম্পানীর বীমা কিস্তি ৩ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯৯১-৯২ তে কিস্তি ছিল ৩৯.৪৪ মিলিয়ন মালয় ডলার। ১৯৯৫-৯৮তে কিস্তির পরিমাণ দাড়ায় ১২০ মিলিয়ন মালয় ডলার।

একই সময় মালয়েশিয়ায় ইসলামী বীমা কোম্পানীর ব্যবসার পরিমাণ হয়ে যায় ৪ গুণ ৩.২ মিলিয়ন ডলার থেকে ১২ মিলিয়নে। উক্ত সময়ে কোম্পানীর সম্পদ বাড়ে ৯৪.৭৭ ডলার থেকে ৩০৪.২৭ মিলিয়ন ডলারে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বীমা কোম্পানীগুলোর মধ্যে শিয়রীকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া সেন্ডিরিয়ান বারহাদ বৃহত্তম।

আঞ্চলিক (তাকাফুল) ইন্সিওরেন্স সংস্থা ঃ মালয়েশিয়া তাকাফুল কোম্পানী শুধুমাত্র নিজেদের কার্যক্রম সম্পাদন করেছে এমন নয় বরং ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, সিঙ্গাপুরে ইসলামী বীমা কার্যক্রম সংহতকরণে সহযোগিতা করে আসছে।

---

[৬৬] ইসলাম ইন্সুরেন্স (তাকাফুল) এ জেড এম শামসুল আলম, পৃঃ- ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৫ সালে আসিয়ান South East Asian nations Takaful Group নামে একটি সংস্থা মালয়েশিয়া তাকাফুল কোম্পানীর উদ্যোগে গঠিত হয়। এ অঞ্চলে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় সুসংহত করতেই এ সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। এ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হল (১) শিয়ারীকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া (২) আশুরানসি তাকাফুল উলুম, ইন্দোনেশিয়া (৩) আশুরানশি তাকাফুল কেলাগুয়া, ইন্দোনেশিয়া।

ASEAN তাকাফুল গ্রুপের অন্যান্য বীমা কোম্পানী সদস্য হল- (১) ব্রুনাই তাকাফুল ইসলামী ইন্সিওরেন্স বারহাদ (আই,বি,বি), ১৯৯৩ (২) ব্রুনাই তাকাফুল টি,এ সিঙ্গাপুর (৪) মালয়েশিয়া এন, এস, আই, তাকাফুল। [৬৭]

<u>ইউরোপে ইসলামিক ইন্সিওরেন্স</u> ঃ ১৯৮১ সালে জেনেভাভিত্তিক দারুল মাল আল ইসলামী ট্রাষ্ট (ডি, এম, আই) প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিশোধিত মূলধন ছিল ২ মিলিয়ন ইউ,এস, ডলার। এর উদ্যোক্তা ছিলেন মরহুম বাদশাহ ফয়সাল। এ সংস্থাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার লক্ষে গঠিত হয়।

দারুল মাল আল-ইসলামী ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় লুক্সেমবুর্গ তাকাফুল এস এ। এর শাখা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এ কোম্পানী ১১.৫০০ বীমা পলিসি করে। বীমা কিস্তি বাবদ ইউ, এস ডলারে জমা হয় ২০০৫ মিলিয়ন।

যুক্তরাজ্যের তাকাফুল ইউ,কে,লি ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি লুক্সেমবুর্গের তাকাফুল এস, এ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। ১৯৯৬ সালের মধ্যে ২ বছরে এ কোম্পানী ২০০০ গ্রাহকের বীমা গ্রহণ করে। এ বীমা পলিসিগুলোর বেশির ভাগই জীবন বীমা।

<u>ইন্সিওরেন্স সম্মেলন</u> ঃ ইসলামী ইন্সিওরেন্স অগ্রগতির প্রেক্ষাপটে দেশে দেশে ইসলামী বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে আগ্রহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। আঞ্চলিক ও দেশীয় ইসলামী সম্মেলন বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে দুবাইতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ইন্সিওরেন্স সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সৌদি আরব, কাতার, আমিরাত প্রভৃতি দেশের বিশেষজ্ঞ ও

---

[৬৭] ইসলাম ইন্সুরেন্স (তাকাফুল) এ জেড এম শামসুল আলম, পৃঃ- ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

উৎসাহীবৃন্দ ছাড়াও অংশ গ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, লুক্সেমবুর্গ, মালয়েশিয়া ব্রুনাই প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিগণ।

ব্রুনাইতে ইসলামী ইন্সিউরেন্স ঃ ১৯৯৩ সালে ব্রুনাইতে প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি ইসলামী বীমা কোম্পানী। এগুলো তাকাফুল টিএআইবি কোম্পানী লিমিটেড ব্রুনাই (১৯৯৩) এবং তাকাফুল আইবিবি লিমিটেড ব্রুনাই (১৯৯৩)। ঐ বছরেই মালয়েশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় ইসলামী ইন্সিউরেন্স কোম্পানী। এম. এন. আই তাকাফুল মালয়েশিয়া লিমিটেড।

সিঙ্গাপুরে ইসলামী ইন্সিউরেন্স ঃ সিঙ্গাপুর মুসলিম জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার ১৫% , সিঙ্গাপুরে ও ইসলামী বীমার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম নাগরিকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী বীমার গুরুত্বপূর্ণ অবদান লক্ষ্য করা যায়।

মালয়েশিয়ায় দুটি ইসলামী ইন্সিউরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৪ ও ১৯৯৩ সালে। সিঙ্গাপুরের শিয়ারীকাত তাকাফুল সিঙ্গাপুর (এসটিএস) হলো সিঙ্গাপুরের দুটি প্রতিষ্ঠানের যৌথ বীমা প্রকল্প। এ দুটি প্রতিষ্ঠান হল- ১. ক্যাপেল ইন্সিউরেন্স কোম্পানী ২. সিঙ্গাপুর মালয় টিচার্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি।

ক্যাপল ইন্সিউরেন্স কোম্পানী যদিও শিয়ারীকাত তাকাফুল সিঙ্গাপুরের উদ্যোক্তা পার্টনার কিন্তু কোম্পানীর মূল দায়িত্ব হল ইসলামী তাকাফুল কোম্পানীর আন্ডার রাইটার হিসেবে কাজ করা।

সিঙ্গাপুর শরীয়াহ তাকাফুল কোম্পানী সাধারণত সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ী কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করে থাকে। প্রথম দুবছরেই কোম্পানী বিনিয়োগ ৯৬% হারে বৃদ্ধি পায়। প্রথম বছরেই এ কোম্পানী ১৭ মিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার প্রিমিয়াম সংগ্রহ করে।

সিঙ্গাপুরের দ্বিতীয় ইসলামী ইন্সিউরেন্স কোম্পানী হল দি এমপ্রো ইনকাম তাকাফুল কোম্পানী লিঃ। এ কোম্পানী Ampro Holdigs Company এবং NTVC Income Co-operative এর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়।

Ampro Holdigs Company হল সিঙ্গাপুরের একটি সুবৃহত শিল্প কোম্পানী NTVC Income Co-operative হল একটি স্থানীয় মিচুয়াল ইন্সিউরেন্স কোম্পানী।এর

অধিকাংশ ব্যবসা জীবন বীমা সংক্রান্ত এবং কোম্পানীর এজেন্টদের এক বিরাট অংশ হল মুসলিম। এরা ইসলামী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিল।

The Ampro Income Takaful Company Ltd. কোম্পানীর একটি ব্যবসায়িক বৈশিষ্ট্য আছে। এ ইসলামী বীমা কোম্পানীর বহু গ্রাহক বীমার সবগুলো প্রিমিয়াম এক সাথে দিয়ে ফেলে। [৬৮]

প্রাথমিক প্রিমিয়ামের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল ৪০,০০০ সিঙ্গাপুরী ডলার।

সিঙ্গাপুর কর্মকর্তাদের সেন্টাল প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে। যে কোন প্রভিডেন্ড ফান্ড সংরক্ষণকারী ৫৫ বছর বয়সে পৌছলেই বৃদ্ধ বয়সের চিকিৎসা খরচের জন্য কিছু অংশ ছাড়া প্রভিডেন্ড ফান্ডের সব টাকা একসাথে উত্তোলন করে নিতে পারেন।

এ বীমা পলিসিতে মুনাফা বেশী হয় বলে তারা বীমা পলিসি গ্রহণ করে থাকেন। এ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী বিনিয়োগের উপর ১৯৯৬ সালে ১৮.৬% মুনাফা করে। ১৯৯৭ সালে মুনাফার পরিমাণ ছিল ৮.৫%।

১৯৯৮ সালে এমপ্রো হোল্ডিং তাকাফুল কোম্পানীর প্রিমিয়াম ইনকাম হয় ৯ মিলিয়ন সিঙ্গাপুর ডলার। এ কোম্পানী সাধারণত স্থানীয় এবং বিদেশী কোম্পানীর শেয়ার বিনিয়োগ করে থাকে। বিদেশী কোম্পানীর বিনিয়োগের উপর ১৩% হারে ১৯৯৮ সালে আয় হয়েছিল।

ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী ইন্সিউরেন্স ঃ ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম জনসংখ্যা ১৯৯৪ ইং সনে ছিল ১৮ কোটি। ঐ বছরেই ইন্দোনেশিয়ায় সর্বপ্রথম ইসলামী ইন্সিউরেন্স কোম্পানী পি,টি শিয়ারিকাতে তাকাফুল ইন্দোনেশিয়া কোম্পানী লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৯৪)।

মালয়েশিয়া ও ব্রুনাইতে দুটি করে ইসলামী ইন্সিওরেন্স কোং প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯৯৪ ও ১৯৯৫ সালে ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি ইন্সিউরেন্স কোম্পানী। এগুলো হল- ১. পিটি শিয়ারিকাত তাকাফুল ইন্দোনেশিয়া (১৯৯৪)। এটি হল একটি জীবন বীমা কোম্পানী পরবর্তী বছর ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জেনারেল বীমা কোম্পানী PT Insurance Takaful Keluarga Indonesea.

---

[৬৮] জাতীয় সেমিনার স্মরণীকা ২০০৫, প্রাইম ইস: লাইফ ইন্স: কো: লি: পৃঃ- ৩০।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৬ সনে ইন্সিউরেন্স কোম্পানী পিটি শিয়ারীনাত তাকাফুল ইন্দোনেশিয়ার ব্যানারে একটি হোল্ডিং কোম্পানী হিসেবে সংযুক্ত হয়।

পিটি ইন্সুরেন্স তাকাফুল ক্যালু্য়ারগা কোম্পানী ১ বছরে অর্থাৎ ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৬ সালে ইন্সিউরেন্স প্রিমিয়াম বৃদ্ধি পায় ২০৭%।

নীট প্রিমিয়াম ১৯৯৫ সালে ছিল ৩.২৪ বিলিয়ন ইন্দোনেশিয়ান রূপী এবং ১৯৯৬ সালে নীট প্রিমিয়াম দাড়ায় ৯.৯৬ বিলিয়ন রূপী। এক বছরে এ কোম্পানী দেশের ত্রয়োদশ বৃহত্তম ইন্সিউরেন্স কোম্পানীতে উন্নীত হয়। [৬৯]

ইন্দোনেশিয়ার তৃতীয় ইন্সিউরেন্স কোম্পানী PT Insurance Takaful Keluarga Indonesca প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সনে। প্রথম বছর এ জেনারেল ইন্সিউরেন্স কোম্পানীর প্রিমিয়াম ছিল ৩.১৯ বিলিয়ন রূপী।

১৯৯৫ সালে আশুরানসী তাকাফুল জেনারেল কোম্পানীর কর পূর্ব মুনাফা ছিল ২৬৩ মিলিয়ন রূপী। ১৯৯৬ সালে কর পূর্ব মুনাফা দাড়ায় ৭৫৮ মিলিয়ন রূপীতে। এ থেকে বুঝা যায় ইসলামী ইন্সিউরেন্স কোম্পানীর চাহিদা ব্যাপক। সাফল্য ও দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করা হলে তা সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। ইসলামী ইন্সিউরেন্স কোম্পানীগুলো প্রায় ১০% প্রিমিয়াম জাকার্তা স্টক এক্সেঞ্জের মাধ্যমে বিনিয়োগ হয়ে থাকে।

ইন্দোনেশিয়ার ইসলামী সংগঠনগুলো ইসলামী ইন্সিউরেন্স কোম্পানীগুলোকে অত্যাধিক পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। ইন্দোনেশিয়ার দুটি প্রধান ইসলামী সংস্থা মোহাম্মদীয়া এবং নাহদাতুল উলামা এর সংযুক্ত ইসলামী ইন্সিউরেন্স কোম্পানীগুলো যে ইসলামী চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সমর্থনের উপর নির্ভরশীল তা নয় বরং তা তেল ও গ্যাস ইন্ডাস্ট্রিতেও ব্যাপকভাবে প্রবেশ করেছে।

নতুন ইন্সিউরেন্স কোম্পানীগুলোর মধ্যে প্রতিযোগীতা অপেক্ষা সহযোগীতার মনোভাব অত্যাধিক। [৭০]

[৬৯] জাতীয় সেমিনার স্মরণিকা ২০০৫ প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সিউরেন্স কো: লি: পৃঃ- ৩১
[৭০] জাতীয় সেমিনার স্মরণিকা ২০০৫ প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সিউরেন্স কো: লি: পৃঃ- ৩১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশে ইসলামী বীমার ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশে ইসলামী বীমা ঃ পৃথিবীতে সর্ববৃহত মুসলিম সংস্থা হল Organisation of Islamic Conference (OIC) ওআইসি লক্ষ্য ঘোষণায় সদস্য দেশসমূহে ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা ব্যবস্থা চালুর অঙ্গীকার করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ডি-৮ সম্মেলনের ২য় অধিবেশনে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। [১] বাংলাদেশের জনগণ ইসলাম প্রিয়। ইসলামী অর্থনীতি গ্রহণেও তারা প্রস্তুত। তাই ইসলামী বীমার যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশে মানুষ ইসলামী অর্থনীতি গ্রহণে অগ্রগামী। যেমন ইতিমধ্যে এদেশে কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা অন্যান্য সুদী ব্যাংককে পেছনে ফেলে সফলতার চরমশিখরে পৌছতে সক্ষম হয়েছে। এদিকে আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক ও এদেশে ব্যবসা করতে আগ্রহের প্রেক্ষিতে অনুমতি পেয়েছে এবং ব্যবসা পরিচালনা করছে। ব্যাংক ও বীমা পরস্পর পরিপূরক ও সম্পূরক। ইসলামী ব্যাংকের অগ্রগতির সাথে ইসলামী বীমার চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দীর্ঘদিন যাবত ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অভিজ্ঞ মহল থেকে কাগজে কলমে দাবী করা হয়েছে সরকারের নিকট। অনেক দাবী ও শ্রমের পর শেষ পর্যন্ত ১৯৯৯ সালে সরকার ইসলামী নামকরণ ও মেমোরেন্ডাম অব আর্টিকেলস এ শরীয়াহ কাউন্সিল এর তত্ত্বাবধানে দেশে ইসলামী জীবনবীমা ও ইসলামী সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়। তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রি তোফায়েল আহমদের নাম ইসলামী ইন্সিউরেন্সের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বাংলাদেশে ইসলামী ইন্সিউরেন্সের ক্ষেত্রে ২রা মার্চ ১৯৯৯ একটি স্বরণীয় দিন হিসেবে গণ্য হবে। এ তারিখে অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি ৩০টি ইন্সিওরেন্স কোম্পানী অনুমোদন করেন। এর মধ্যে দুটি ইসলামী ইন্সিউরেন্স কোম্পানী রয়েছে। একটি হল ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী এবং অপরটি হল ইসলামী ইন্সিউরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড। এ দুটি ইসলামী ইন্সিওরেন্সের প্রধান উদ্যোক্তা দুজন মহিলা। মিসেস নিগার সুলতানা এবং মিসেস ফারহানা আলম। ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ২০০০ সালে কার্যক্রম শুরু করে। তার পূর্বে হোম ল্যান্ড লাইফ ইন্সিওরেন্স তাকাফুল

---

[১] ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল। ড. আ.ই.ম নেছার উদ্দিন, পৃঃ- ২৬।

উইং নামে ইসলামী বীমার তাকাফুল প্রকল্প ১৯৯৮ কার্যক্রম শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বাংলাদেশে ইসলামী বীমা ব্যবসায় অনেকেই ঝুকে পড়ে। ২০০০ ও ২০০১ সালে এ দেশে অনেকগুলো ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। তাকাফুল ইসলামী ইন্সিউরেন্স কোং লি: ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ব্যবসা শুরু করে। ইসলামিক ইন্সিউরেন্স বাংলাদেশ লি: ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে ইসলামী বীমা ব্যবসা লাভজনক হবার কারণে মেঘনা লাইফ ইন্সিউরেন্স বাংলাদেশ লি: ২০০১ সালে ইসলামী বীমা (তাকাফুল) প্রকল্প চালু করে। সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্সিউরেন্স কোং লি: ও বাংলাদেশে ইসলামী বীমার চাহিদা বিবেচনা করে ২০০১ সালে তাকাফুল প্রকল্প চালু করে। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পদ্মা লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লি:। ইসলামী কমার্সিয়াল ইন্সিউরেন্স লি: প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০১ সালে। পপুলার লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লি: ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশে ইসলামী ইন্সিউরেন্সের ইতিহাসে ২০০১ সাল মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ইসলামী ইন্সিউরেন্সের ক্রম-উন্নতি লক্ষ্য করে অনেক বীমা কোম্পানী ইসলামী বীমা (তাকাফুল) প্রকল্প চালু করতে বাধ্য হয়। তার পর ২০০২ সালে প্রাইম ইসলামী ইন্সিওরেন্স লিঃ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী লাইফ ইন্সিওরেন্স হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। পপুলার ইসলামী লাইফ ইন্সিওরেন্স ও ইসলামী বীমা কার্যক্রমে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ ইসলামী বীমা সম্ভাবনাময় দেশ। ইসলামী বীমার অগ্রগতি দেখে অন্যান্য সাধারণ বীমা কোম্পানীগুলো তাদের ইসলামী শাখা খুলতে বাধ্য হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী ইন্সিওরেন্সের কোন আইন নেই। এদেশে ইসলামী বীমার আইনগত সমস্যা সমাধানের জন্য সেন্ট্রাল শরীয়াহ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে মাওঃ উবায়দুল হক সাহেব ২০০৩ সালে বীমা আইন সংস্কার ও ইসলামী বীমার প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী আইনে সংযোজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রস্তাবনা পেশ করেছেন। আবার ২০০৫ সালেও তিনি ইসলামী বীমা পরিচালনার ক্ষেত্রে পৃথক আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের নিকট খসড়া প্রস্তাব পেশ করেছেন। সরকার বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে এর জন্য একটি কমিটি গঠন করেছে। আশা করা যায় অচিরেই ইসলামী বীমার জন্য বাংলাদেশে একটি পৃথক আইন চালু হবে। বর্তমানে দেশে ১৬টি কোম্পানী সরাসরি বা প্রকল্প চালুর মাধ্যমে ইসলামী বীমার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। দেশে ইসলামী বীমা আইন না হলেও বীমাসমূহের কার্যক্রম ইসলামভিত্তিক পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে Insurance (Takaful) consultative forum, Takaful Excutive forum, central shariah council for Islamic Insurance of

Bangladesh নামে কয়েকটি সংগঠন ইসলামী ইন্সিওরেন্সগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছে। ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীগুলো বেসরকারীভাবে অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষই ইসলামী বীমা সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখে না। অথচ গত দুদশকে পৃথিবীতে শতাধিক ইসলামী বীমা কোম্পানী সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে ইসলামী অর্থনীতিতে সারা জাগাতে সক্ষম হয়েছে। সুদান ও মালয়েশিয়ার মত দেশে ইসলামী বীমার জন্য পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ অধ্যাদেশ পাশ করে ইসলামী বীমা পরিচালিত হচ্ছে। মালয়েশিয়া গত এক দশকে ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। মালয়েশিয়ার বিশ্ব বিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী বীমার জন্য ইসলামী ব্যাংকের মত পৃথক বিভাগ রয়েছে এবং তার উপর ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। শুধু মুসলিম দেশেই নয় অমুসলিম দেশে ইসলামী বীমার প্রসারতা লক্ষ্য করা যায়। অস্ট্রেলিয়া, লুক্সেমবার্গ, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা ও ইংল্যান্ডসহ আরো কিছু অমুসলিম দেশে ইসলামী বীমা জোরালোভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ মনে করত সুদ ছাড়া ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক পরিচালনা অসম্ভব। বিশ্বে সুদী অর্থনীতিই যখন একমাত্র অর্থনীতি হিসেবে গণ্য এমন সময় কিছু ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষক ও স্কলারগণ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন যে, ইসলাম পদ্ধতিতে অর্থনীতি হচ্ছে মানবতার কল্যাণ ও মুক্তির অর্থনীতি। ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে যাদের মাঝে নেতিবাচক ধারণা ছিল তারা ভাবেননি যে, অর্থনীতি ছাড়া ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হয় না। অথচ আল্লাহ কুরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন-

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا.[২/২]

অর্থাৎ, আজকে আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকেও পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।

আধুনিক অর্থনীতি ব্যাংক ও বীমা ছাড়া কল্পনা করা যায় না। তাই ইসলামী অর্থনীতি আধুনিক যুগে ব্যাংক ও বীমা ছাড়া হতে পারে না।

---

[২] আল কুরআন, সূরা মায়েদাহ, ৩ নং আয়াত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের বীমা কোম্পানীগুলো পেশাদার লোক তৈরির জন্য বিভিন্ন ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেছে এবং পৃথক Training & Researce Depatment দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করছে। পাশাপাশি গবেষণার ব্যবস্থা ও চলছে এবং এর দ্বারা কোম্পানীগুলো ভাল ফলাফল করছে। জাতীয়ভাবে এক্ষেত্রে জনশক্তি উন্নয়ন এবং ইসলামী ব্যাংক – বীমা কাজের সমন্বয়ের জন্য গত ১লা জুন ০৪ থেকে ১৫ জুন ০৪ পর্যন্ত ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো পক্ষকাল ব্যাপী Islamic Insurance শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। ব্যাপক নিয়োগদর্শী ও সমন্বিত উদ্যোগ হিসেবে এটা বাংলাদেশে এই প্রথম যারা Islamic Insurance বুঝেন, গবেষক, বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৩০ জন Resource person এর একটি মর্যাদাসম্পন্ন প্যানেল থেকে Trainer নির্বাচন করা হয়েছে। সেখানে ৬টি Module এ (A-F) পর্যন্ত Emergence And Grouth of Insurance, foundation of Insurance conve ntional VS Islamic, Mechanism & Function ing of Islamic Practice Law ইত্যাদি বিষয়ে Session গুলো পরিচালিত হয়। ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর ২০ জন কর্মকর্তা Trainee হিসেবে এতে অংশগ্রহণ করেন। ১৫ দিনের ট্রেনিং এর মধ্যে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের দেশে কেবল নয়; বরং সারা বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ও বীমার প্রথার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে এবং বাংলাদেশ পদ্ধতিগত উৎকর্ষ সাধনে অনেক পিছিয়ে আছে।

ইসলামী রি-ইন্সিউরেন্স : কোন গ্রামে ১০০০ জন লোক একতাবদ্ধ হল অগ্নি বীমা থেকে বাচার জন্য এক বছরের জন্য প্রত্যেকে চাঁদা দিয়ে একটি ফান্ড তৈরি করবে এবং যার বাড়ীতেই আগুন লাগুক না কেন ঐ ফান্ড থেকে তাকেই ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সকলে মিলেই ঠিক করল প্রত্যেক বাড়ীর ক্ষতিপূরণ মূল্য একলক্ষ টাকা, যারই ক্ষতি হোক না কেন তাকেই এক লক্ষ টাকা দেয়া হবে। তাহলে প্রত্যেকে প্রিমিয়াম দিতে হবে $\frac{১}{১০০০}$ X ১,০০,০০০ ১০০ টাকা। প্রত্যেকে ১০০ টাকা করে প্রিমিয়াম দিলে বছরে গ্রহীত হবে ১০০ X ১,০০০ ১ (এক) লক্ষ টাকা। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে যদি নিধারণ হয় যে, বছরে আগুন লাগার সম্ভাবনা একটি বাড়ীতে এবং তাকে দিতে হবে এক লক্ষ টাকা আর ফান্ড ও হবে এক লক্ষ টাকা। ১০০ টাকা প্রিমিয়াম দ্বারা ক্ষতি পূরণের এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হবে। শুধু এক লক্ষ টাকা ফান্ড হলেই চলবে না। ফান্ড পরিচালনার জন্য বীমা

কোম্পানীকে ব্যয় করতে হবে। বীমা কোম্পানীতে যারা বিনিয়োগ করবেন তাদেরকে লাভ দিতে হবে। এসব কিছু যোগ করে যা হবে তাই হবে মোট প্রিমিয়াম। সাধারণভাবে বলা যায় ঝুঁকির প্রিমিয়ামের সাথে এর অর্ধেক যোগ করলে মোট প্রিমিয়াম বের হয়। তাহলে এক লক্ষ টাকার একটি বাড়ীর অগ্নি বীমার প্রিমিয়াম হবে ১৫০ টাকা।[৩]

চুক্তিবদ্ধ এক হাজার জনের কেউ যদি বলেন যে, তাদের বাড়ীর মূল্য এক লক্ষ টাকার বেশি এবং তাদেরকে এক লক্ষ টাকার বেশি কভার দিতে হবে। আরো ধরা যাক ঐ বেশি অংকের ঝুঁকি সম্বলিত একাধিক ব্যক্তির বাড়ীতে আগুন লেগে ক্ষতি হল। তখন সংগৃহিত উক্ত ফান্ডের মাধ্যমে দাবী পরিশোধ করা যাবে না। ফান্ডে ঘাটতি পড়বে। এর প্রতিরোধ ব্যবস্থার নামই হচ্ছে পুন:বীমা (Re Insurance). একটি বীমা কোম্পানী যে পরিমাণ ঝুঁকি বহন করতে সক্ষম হয় সে পরিমাণ ঝুঁকি নিজের উপর রেখে বাকী অংশ পুন:বীমা কোম্পানীকে অর্পণ করে। যে পরিমাণ ঝুঁকি নিজেরা রাখেন তাকে বলা হয় (own retention).[4] পুন:বীমা কোম্পানীকে যে অংশ অর্পণ করাকে বলা হয় Cede করা। রি-ইন্সিউরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে পুণ:বীমার প্রিমিয়াম বাবদ মূল ইন্সিউরেন্স কোম্পানীকে বিধিমত প্রিমিয়াম জমা দিতে হয়। পুন:বীমা করা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন হলে মুল ইন্সিউরেন্স কোম্পানী পুন:বীমা কোম্পানী থেকে ক্ষতিপূরণের জন্য পারস্পরিক স্বীকৃতি হারে ক্ষতিপূরণের অর্থ পায়। এটা ছোট ইন্সিউরেন্স কোম্পানীর জন্য অনেক বড় ধরনের সহায়তা। যেমন একটি বিমানের মূল্য কোটি টাকা পুন:বীমা ব্যবস্থা না থাকলে অনেক কোম্পানীর পক্ষে এত বড় সম্পত্তির বীমা করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। বীমা ব্যবসা সম্প্রসারণের স্বার্থেই পুন:বীমা প্রয়োজন।[৫]

(Retrocession) পুণ:বীমার পুণ:বীমা ঃ কোন বীমা কোম্পানী তার ঝুঁকির অংশ অন্য বীমা কোম্পানীর সাথে পুণ:বীমা করে অন্যের উপর ছেড়ে দিলে পুণ:বীমার কাজ শেষ হয়ে যায় না। পুণ:বীমা কোম্পানীও প্রয়োজনবোধে তৃতীয় একটি বীমা কোম্পানীর সাথে

---

৩ সাধারণ বীমা অ.আ.ক.খ. এম. এ. সামাদ পৃঃ- ৮

৪ সাধারণ বীমা অ. আ. ক. খ এম এ সামাদ, পৃঃ- ৮

৫ ইসলামী ইন্স্যুরেন্স (তাকাফুল) এ. জেড. এম. শামসুল আলম, পৃঃ- ৮১

পুণ:বীমা করতে পারে। এ তৃতীয় বীমা কোম্পানীর সাথে পুণ:বীমা করাকে বলা হয় Retrocession[৬]

<u>ইসলামী রি-ইন্সিউরেন্স কোম্পানীর তালিকা</u> : ইসলামী Re Insurance কোম্পানী জেদ্দা আরব অঞ্চলের সবচেয়ে বড় রি-ইন্সিউরেন্স কোম্পানী। জেদ্দাভিত্তিক অপর একটি রি-ইন্সিউরেন্স কোম্পানী হল তাকাফুল এন্ড রি-তাকাফুল কোম্পানী লিমিটেড জেদ্দা। উত্তর আফ্রিকার বৃহত্তম রি-ইন্সিউরেন্স কোম্পানী হল তিউনিশিয়ার বাইত লাদাত ইত্যার নাইন সাউদী তুলসী। Beet ladat Ettarnine Saoudi Tounsi সংক্ষেপে হল BESTE নামে পরিচিত। [৭]

সৌদি আরবে প্রথম রি-ইন্সিউরেন্স কোম্পানী The National Company for Co-oparative Insurance প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৬ সালে। এ কোম্পানী আরব দেশসমূহের তেল শিল্প এবং বীমা কোম্পানীসমূহের বিমান বহরের পুণ:বীমা করে থাকে এ কোম্পানী কর্তৃক অর্জিত বীমার প্রিমিয়াম হল এতদ অঞ্চলের সমগ্র বীমা বাণিজ্যের ২৫% ।

১৯৯৩ সালে National company for Co-oparative Insurance (NCCI) উদ্বৃত্ত ২৯ মিলিয়ন সৌদি রিয়াল যে সমস্ত কোম্পানী NCCI এর রি-ইন্সিউরেন্স করেছিল তাদের মধ্যে বিতরণ করেছে।

মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশ হল ইউ, এই (United Arab Amirat) । মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২৩০০০ ডলার। কাতার ২১০০০, কুয়েত ১৬০০০, ব্রুনাই ১৫০০০, বাহরাইন ১৩০০০, মালয়েশিয়া ১০,০০০, সৌদি আরব ১০,০০০, ওমান ৯০০০, তুরস্ক ৬০০০, ইরান ৫০০০, জর্ডান ৫০০০, ১৯৯৬ ইং সালের জরিপে উক্ত হিসাব ধরা হয়েছে। সুইজার ল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় দার আল-মাল জেনেভা ১৯৮৩। লুক্সেমবার্গ ও বাহামায় ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তাকাফুল ইসলাম লুক্সেমবার্গ এবং তাকাফুল ইসলাম বাহামা। [৮]

<u>যৌথ বীমা (Co-Insurance) :</u> কোন পলিসি হোল্ডার বা বীমা গ্রাহক বীমা কোম্পানীকে পুন:বীমা করার জন্য পুণ:বীমা কোম্পানী নির্বাচনের অধিকার না দিয়ে নিজেই

---

৬ ইসলামী ইন্স্যুরেন্স (তাকাফুল) এ. জেড. এম. শামসুল আলম, পৃ:- ৮২

৭ জাতীয় সেমিনার স্মরণিকা ২০০৫, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, পৃ- ৩২

৮ জাতীয় সেমিনার স্মরণিকা ২০০৫, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স, পৃ- ৩২

তার পছন্দমত তিনটি বড় বীমা কোম্পানীর সাথে একই সঙ্গে যৌথ বীমা (Co-Insurance) চুক্তি করতে পারে। বীমা গ্রাহক একটি বীমা কোম্পানী দশ কোটি টাকার ৫০% অপর একটি কোম্পানীকে ৩০% এবং অন্যটিকে ২০% বীমা পলিসি দিলেন। এ তিন কোম্পানীর মধ্যে যাকে ভাল মনে করা হয় তাকে নেতা করা হবে। তিনটি বীমা কোম্পানী যৌথভাবে পলিসি গ্রহকের ফার্মের সাথে বীমা চুক্তি করবে। এ তিনটি বীমা কোম্পানীর মধ্যে যার সঙ্গে বীমা গ্রাহকের সম্পর্ক ভাল ও আস্থা বেশি তাকে নেতা নির্ধারণ করে যোগাযোগ ও চিঠিপত্র আদান প্রদান করবে।

বীমা পলিসির যে দলীল হবে তাতে তিনটি কোম্পানী স্বাক্ষর করবে এবং প্রত্যেকে তার নিজের ভাগের জন্য দায়ী থাকবে। প্রত্যেক কোম্পানীর দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকবে এবং বীমা গ্রাহক কর্তৃক দাবী উত্থাপিত হলে তা পরিশোধ করতে প্রত্যেকে বাধ্য থাকবে।

যৌথবীমার ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় কোম্পানীই যৌথ বীমার শরীকদের থেকে তাদের দায়-দায়িত্বের অংশ আদায় করে বীমা গ্রাহককে পরিশোধ করবে।[১]

---

[১] ইসলামী ইন্সুরেন্স (তাকাফুল) এ.জেড.এম শামসুল আলম, পৃঃ ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমা পদ্ধতিতে পুন:বীমা

ইসলামী পদ্ধতিতে পুন:বীমা আনুপাতিক হারমুখী হওয়া উচিত। যেখানে পুন:বীমাকারী বাস্তবে মূল ঝুকিসহ বীমাকারীতে পরিণত হয়। ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় মুসলিম বিশ্বে বীমা শিল্পের ইতিবাচক সম্প্রসারণের জন্য ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোর উচিত নিজেদের মধ্যে সহ বীমার প্রতি উৎসাহিত হওয়া। পুন:বীমা কোম্পানী সাধারণ বীমা কোম্পানীর মতই ইসলামী শরিয়াহ এর অধীনে কাজ করতে পারে। ইসলামী পুন:বীমা কোম্পানী ইসলামী সমবায় (তাকাফুল) নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করতে পারে এবং দুটি পৃথক তহবিল ১. অংশগ্রহণকারী কোম্পানীসমূহ ও ২. শেয়ার হোল্ডারদের তহবিল রাখা ও পরিচালনা করতে পারে। অংশগ্রহণকারী কোম্পানী সমূহের উদ্বৃত্ত অর্থের আংশিক বা পুরোটা বিশেষ রিজার্ভ হিসেবে রাখা যায় এবং তা অন্যান্য রিজার্ভ কোম্পানীর সাথে বিবেচ্য হতে পারে। রিজার্ভ তহবিলের পাওনা বন্টনের পর যদি ব্যালেন্স থাকে তবে সে নির্দিষ্ট বছরে প্রতিটি কোম্পানীর পুন:বীমা প্রিমিয়ামের আনুপাতিক হারে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। অংশ গ্রহণকারী কোম্পানীগুলোর তহবিলে ক্ষতি হলে তা প্রাপ্ত শেয়ার হোল্ডারদের তহবিল থেকে মেটানো হতে পারে। ইসলামী পুন:বীমা কোম্পানী অংশগ্রহণকারী কোম্পানীগুলোর এবং শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আরো পুন:বীমার ব্যবস্থা করতে পারে, যাকে বলা হয় রেট্রোসেশন প্রটেকশন।

পুন:বীমা বা রেট্রোসেশন প্রটেকশন নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোর উচিত শুধুমাত্র ইসলামী পুন:বীমা কোম্পানীগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়া। লাভ বন্টনের ব্যবস্থার ভিত্তিতে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো বাণিজ্যিক বীমা ও পুন:বীমা কোম্পানীগুলোর সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারে।

একথা আমাদের জানতে হবে, উন্নত বীমা তথাকথিত অদৃশ্য রপ্তানীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে থাকে সঠিকভাবে বলা যায় অদৃশ্য লুন্ঠন। তাই ইসলামী বীমা ও পুন:বীমার উন্নয়ন এসব অদৃশ্য লুন্ঠন থেকে জনগণকে রক্ষা করতে পারে। [১০]

ওআইসি সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রস্তাবিত ইসলামী পুন:বীমা কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা সমগ্র বিশ্বে ইসলামী বীমার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এ ধরণের পুন:বীমা গঠনের

---

[১০] জাতীয় সেমিনার স্মরণিকা ২০০৫, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, পৃ- ৪৩

পূর্ব পর্যন্ত ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোর উচিত হবে পারস্পরিক ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ বিদেশী পুন:বীমা গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে ঝুঁকি ছড়িয়ে দেয়া। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণের সাথে সর্বোচ্চ নিরাপত্তার মাধ্যমে বীমার ব্যয় সর্বনিম্ন থাকবে।

বড় ধরনের ক্ষতিপূরণের দাবির সমস্যা লাঘবের জন্য ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো একটি এসোসিয়েশন গঠন করতে পারে। এতে কোন সদস্য সম্মত পরিমাণের অতিরিক্ত দাবি প্রদানের প্রয়োজন পড়লে নিজেদের মধ্যে যৌথ বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে নিবে। সমিতি যৌথ বন্দোবস্তের মাধ্যমে ঝুঁকির একটি অংশ বহন করবে এবং বিনিময়ে বাজারে পুন:বীমার ব্যবস্থা করবে। সমিতির মাধ্যমে যদি পুন:বীমা সম্পাদন করা হয় তা অন্য কোন একক বীমা কোম্পানীর সম্ভাব্য খরচে চেয়ে কম হবে। ঝুঁকির আকার এবং বিস্তৃতির কারণে এটা হতে পারে। বাস্তবিকই যৌথ বন্দোবস্ত ও পুন:বীমার এ পদ্ধতিটি ১৮৯৯ সাল থেকে মিচুয়াল প্রটেকটিং এন্ড ইনডেমনিটি ক্লাবের মাধ্যমে সফলভাবে অনুসৃত হয়ে আসছে। পি এন্ড আই গ্রুপের তথা লন্ডন গ্রুপের সদস্যরা তাদের সমতার আলোকে চাঁদা দিয়ে থাকে। এর মানে প্রতিটি সদস্য তার সার্বিক প্রিমিয়াম আয়ের সাথে সম্পৃক্ত হারে যৌথ বন্দোবস্ত চাঁদা দিয়ে থাকে। ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলোও নিজেদের মধ্যে যৌথ বন্দোবস্তে আসতে পারে। এর ফলে বীমাকারীর পুন:বীমা খরচ হ্রাস পাবে। যেহেতু নীতিগতভাবে বীমার আন্তর্জাতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং ইসলামী শরীয়াহ এর আলোকে ক্ষতিপূরণ সামাজিক যৌথ বন্দোবস্তের মাধ্যমে করা সম্ভব। পুন:বীমা পদ্ধতি রাজনৈতিক ও ভৌগলিক সীমার উর্দ্ধে উঠে মুসলিম উম্মাহর জন্য এ ধরনের পুন:বীমা ব্যবস্থা অধিকতর কল্যাণ বয়ে আনবে। [১১]

---

১১ জাতীয় সেমিনার স্মরণিকা ২০০৫, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লি: পৃ- ৪৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী বীমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাপক। তম্মধ্য থেকে প্রধান কয়েকটি নিম্নরূপ-

১। হালাল আয় নিশ্চিত করা।

২। ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক জীবন বীমার প্রচলন ও পরিচালনা করা।

৩। একটি মেয়াদের মধ্যে জমাকৃত অর্থ ফেরতদানসহ মুনাফা পাওয়ার নিশ্চয়তা বিধান করা।

৪। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করা।

৫। শরীয়াহ আইন ও শর্তাবলীর সাথে বৈপরীত্য নেই এমন পদ্ধতিতে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করা।

৬। হালালভাবে সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করা যাতে উত্তরাধিকারীগণ রিক্ততা ও নিঃস্বতার কারণে পরনির্ভরশীল না হয়।

৭। ইসলামী জীবন বীমার ন্যায় সাধারণ বীমা ও ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক প্রচলন ও পরিচালনা করা।

৮। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ঝুঁকির বিপরীতে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করা এবং লভ্যাংশ বন্টন নিশ্চিত করা।

৯। সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের মধ্যে মানবতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভাব জাগ্রত করা।

১০। মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

১১। জন কল্যাণ মুখী হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা এবং দুর্যোগকালীন সামাজিক দায়িত্ব পালন করা।

১২। পারস্পরিক দায়বদ্ধতার আলোকে আর্থিক নিরাপত্তার সেতুবন্ধন রচনা করা।

১৩। দারিদ্র্য দূর করে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা।

১৪। সমবায় চিন্তা চেতনায় ইসলাহে মোয়াশারাত বা সমাজ সংশোধনের চেষ্টা করা।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

ইসলামী বীমার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-

১। শুধু শরিয়ত অনুমোদিত খাতসমূহে ইসলামী পদ্ধতিতে কোম্পানীর মূলধন ও উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ করবে।

২। একটি শরীয়াহ কাউন্সিল কোম্পানীর কার্যবিধি পরিচালনা করবে এবং বৈধ অবৈধ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিবে।

৩। কোম্পানীর শেয়ার মালিকদের মূলধন বীমা গ্রাহকের মূলধন থেকে আলাদা সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ করবে।

৪। বীমা গ্রাহকগণের প্রদত্ত চাঁদা হতে গঠিত তহবিল সংরক্ষিত তহবিলের বিনিয়োগ জনিত লাভের অংশ চুক্তির শর্ত ও পরিচালক গণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীমা গ্রাহকদের মধ্যে বন্টন করা।

৫। বীমা গ্রাহকদেরকেও বীমা কোম্পানীর মালিক বলে স্বীকার করা হয়।

৬। পরিচালনা পরিষদে বীমা গ্রহীতাদের মধ্য হতে সদস্য নির্বাচন করা হয়।

৭। কি হারে লাভ বন্টন করা হয় তা চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

৮। ইসলামে নিষিদ্ধ কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাবে না।

৯। উদ্বৃত্ত লাভে পলিসি হোল্ডারদের অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে।

১০। শেয়ার মূলধন রিজার্ভ ও লাভ থেকে বার্ষিক ২.৫% হারে যাকাত আদায় করতে হবে এবং শরীয়াত অনুমোদিত খাতে তা ব্যয় করতে হবে।

ইসলামী বীমার পদ্ধতি ও আইনগত বৈশিষ্ট্য

প্রথমতঃ ইসলামী বীমার প্রধানত বৈশিষ্ট্য হল স্বচ্ছতা, ইসলামী বীমা কোম্পানী তাকাফুল স্কীমে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যদের প্রদত্ত অর্থের আমানতদার। জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগের পদ্ধতি জমাকৃত অর্থের কত অংশ জমাকারীর নিজস্ব ফান্ডে জমা হবে ,কত অংশ তাবাররুন বা অনুদান ফান্ডে জমা হবে ,লাভের কত শতাংশ কোম্পানী গ্রহণ করবে,

কত শতাংশ জমাকারীর ফান্ডে জমা হবে, এ সকল বিষয়েই চুক্তিতে সময় স্পষ্ট উল্লেখ করতে হবে। সাধারণ জীবন বীমা পলিসিতে এ ধরনের কোন বিষয়ের উল্লেখ থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ প্রতি বছর লভ্যাংশের হিসাব প্রতিটি পলিসি গ্রহণকারীর নিকট পাঠাতে হবে।

তৃতীয়ঃ ইসলামী জীবন বীমার সমর্পণ মূল্য নির্ণয় করা হবে সনাতন বীমা পদ্ধতি হতে ভিন্ন পদ্ধতিতে। সাধারণ বীমা আইনে সমর্পণ গ্যারান্টিকৃত সমর্পণ মূল্য নির্ণয়ের ফর্মুলা বীমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত হয়। ইসলামী জীবন বীমায় সমর্পণ মুল্য নির্ভর করবে অংশ গ্রহণকারীর লাভসহ যা জমা আছে তার উপর।

চতুর্থঃ ইসলামী বীমা স্কীমে অংশগ্রহণকারীর ভুল তথ্য / মিথ্যা তথ্য প্রদানের কারণে চুক্তি বাতিল হতে পারে, কিন্তু অংশগ্রহণকারীর প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা যায় না। সাধারণ বীমা পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বীমা চুক্তি মোতাবেক প্রিমিয়াম দেয়া না হয় তাহলে বীমা পত্রটি বাতিল হয় এবং যদি বীমা পত্রটি পরিশোধিত মূল্য প্রাপ্ত না হয় (Paed up velue) তাহলে জমা দেয়া টাকা ফেরত দেয়া হয় না। ইসলামী জীবন বীমায় যে কোন অবস্থায় নিজস্ব হিসাব ফান্ডে জমাকৃত টাকা লাভসহ ফেরত দেয়া হবে। এমনকি বীমা গ্রাহক আত্মহত্যা করলেও তার নিজস্ব হিসাব ফান্ডে জমাকৃত টাকা লাভসহ ফেরত দেয়া হয়।

পঞ্চমঃ সাধারণ বীমা ব্যবস্থায় বীমা গ্রহকের মনোনীত ব্যক্তি পলিসি টাকার এককভাবে অধিকারী হয়। কিন্তু ইসলামী জীবন বীমা ব্যবস্থা মনোনীত ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়ে থাকেন তাহলে তিনি কোম্পানী থেকে যে অর্থ পেয়ে থাকেন তা ইসলামের উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী বন্টনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হয়।

ষষ্ঠঃ ইসলামী জীবন বীমায় অংশগ্রহণকারীর নিজস্ব হিসাব ফান্ডে লভ্যাংশের অর্থ নিয়মিতভাবে জমা করার পাশাপাশি অনুদান হিসাব ফান্ডের নীট উদ্বৃত্তংশ গাণিতিক মূল্যায়ণের (Acuarial valuation) ভিত্তিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুনঃবন্টন করতে হয়। সনাতন বীমার লাভবিহীন পলিসি বিক্রয় করা যায়। কিন্তু ইসলামী জীবন বীমায় অংশগ্রহণকারী সব সময়ই লাভের হকদার।

ইসলামী আইনে বিনিয়োগ পদ্ধতি

আল্লাহ সুদকে হারাম ঘোষণা করে বিনিয়োগেও উৎপাদন প্রক্রিয়াসহ ব্যবসা বাণিজ্যকে হালাল করেছেন। রাসূল (স) ও বলেছেন নিজের অর্জিত সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে যারা জীবন দিবে তারা শহিদ। তিনি শ্রমজীবি মানুষকে আল্লাহর বন্ধু হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সৎ সত্যবাদী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও নেককার লোকদের বেহেস্তের সাথী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেন করার ক্ষেত্রে ইসলামী বিনিয়োগ নিম্নরূপ-

<u>মুদারাবাহ</u> ঃ বাইয়ে মদারাবাহ (البيع المضاربة) হচ্ছে এক প্রকার অংশীদারী ব্যবসা। আর ইসলামে ব্যবসায় নীতির মৌলিক দিক হল মুদারাবাহ পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে রাসূল (স) হযরত খাদিজা (রা) এর ব্যবসা পরিচালনা করেছেন। যে ক্ষেত্রে রাসূল (স) ছিলেন মুদারিব আর খাদিজা (রা) ছিলেন সাহিবুল মাল বা রাব্বুল মাল। মুদারিব অর্থ হল শ্রমদানকারী আর রাব্বুল মাল বা সাহিবুল মাল অর্থ সম্পদের মালিক।

যে ব্যবসায় একপক্ষ ব্যবসার মূলধন সরবরাহ করে এবং অপর পক্ষ মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বীয় শ্রম ও অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং চুক্তির ভিত্তিতে মুনাফার অংশীদারিত্ব লাভ করে তাকে বাইয়ে মুদারাবাহ বলে।

মুদারাবাহ শব্দটি দারবুন (ضرب) শব্দ থেকে গঠিত। আভিধানিক অর্থ হল- জমিনে পদাঘাত করা, চলাফেরা করা। উদ্যোক্তা বা শ্রম বিনিয়োগকারী যেহেতু জমিনে পদচারণা করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলাচল করতে হয়। তাই হানাফী মাযহাবের ফকিহগণ এ পদ্ধতির ব্যবসার নাম দিয়েছেন মুদারাবাহ। আর শাফেয়ী মাযহাবের ফকিহগণ এর নাম দিয়েছেন কিরাদ (قراض) বা ধারে ব্যবসা করা। এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন-

واخرون يضربون في الارض ويبتغون من فضل الله[১১]

অর্থাৎ, এবং তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোক আল্লাহ করুণার (মুনাফা) সন্ধানে পৃথিবীতে বিচরণ করে।

---

[১১] আল কুরআন সূরা মুযাম্মিল, আয়াত নং- ২০

মুদারাবাহ দু প্রকার। ১. মুদারাবাহ মুতলাক, ২. মুদারাবাহ মুকাইয়াদ।

১. মুদারাবাহ মুতলাক ঃ যে মুদারাবাহ চুক্তিতে ব্যবসার স্থান, সময়-সীমা, শ্রেণী, অংশীদারগণের সংখ্যা, ব্যবসার প্রকৃতি, পরিধি ইত্যাদি কোন কিছুই নির্দিষ্ট থাকে না তাকে মুদারাবাহ মুতলাক বলে। এ পদ্ধতিতে মুদারিব যে কোন স্থানে যে কোন পণ্যের ব্যবসা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করতে পারে। এছাড়া ব্যবসায়িক স্বার্থে কর্মচারী নিয়োগ, অফিস ভাড়া, কাউকে ঋণ দেয়া, ঋণ নেয়া ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে। তবে মুদারিব রাব্বুল মাল তথা মূলধনের মালিকের অনুমতি ব্যতীত ব্যবসার মূলধন নিজের মালের সাথে মিশাতে, কিংবা অন্য কাউকে মুদারাবাহ চুক্তিতে ব্যবসায় করার জন্য পুঁজি প্রদান করতে পারবে না।

২. <u>মুদারাবাহ</u> মুকাইয়াদাহ ঃ যে মুদারাবাহ চুক্তিতে ব্যবসায়ের স্থান, পরিধি, প্রকৃতি সময়সীমা, শ্রেণী, অংশীদারগণের সংখ্যা ক্রয় ও বিক্রয়ের স্থান ইত্যাদিসহ যাবতীয় বিষয় কিংবা কোন একটি বিষয় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় তাকে মুদারাবাহ মুকাইয়াদাহ বলে।

<u>বাইয়ে মুরাবাহা (البيع المرابحة) ঃ</u> মুরাবাহা (مرابحة) শব্দের অর্থ উপকার করা বা লাভ করা। কোন মাল ক্রয়ের পর নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ যোগ করে তা পুনরায় বিক্রয় করাকে বাইয়ে মুরাবাহা (البيع المرابحة) বলে। ইংরেজিতে এ পদ্ধতিকে বলা হয় Contact sale on profit অর্থাৎ চুক্তির ভিত্তিতে লাভে বিক্রয়। এ পদ্ধতিতে মালামালের ক্রয় মূল্যের সাথে পরিবহণ খরচ, গুদামভাড়া, পাহারাদারের মজুরী, শুল্ক ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ যোগ করার পর মালের যে মূল্য দাড়াবে তাকে ক্রয় মূল্য বলে উল্লেখ করা যাবে না; বরং মালের ক্রয়মূল্য আলাদা এবং আনুষাঙ্গিক খরচ আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হবে। এ পদ্ধতির ব্যবসা শরিয়তে অনুমোদিত।

<u>বাইয়ে মুয়াজ্জল (البيع الوجل) ঃ</u> বাইয়ে মুয়াজ্জল হল বাকীতে বিক্রয় করা। এ পদ্ধতিতে বিক্রিত মাল ক্রেতাকে আগে সরবরাহ করা হয় এবং ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। বাকী বিক্রয় ইসলামী বিধান সম্মত। রাসূল (স)-এর হাদীস-

عن عائشة قالت اشتري رسول الله (ص) من يهودي طعاما ورهنه درعا له من حديد[১৩/১৩]

---

[১৩] মুসলিম শরীফ باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসুল (স) জনৈক ইয়াহুদী থেকে বাকীতে কিছু খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করেছেন এবং মূল্য পরিশোধ করা পর্যন্ত নিজের লৌহ বর্মটি বন্ধক রেখেছেন।

বাইয়ে সালাম (البيع السلم) ঃ বাইয়ে সালাম হচ্ছে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়। একে বাইয়ে সালাফ (البيع السلف) ও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে মালের মূল্য বিক্রেতাকে আগে পরিশোধ করা হয়। তবে মাল ক্রেতার নিকট সরবরাহ বা হস্তান্তর করা হয় ভবিষ্যতের নির্দিষ্ট একটি সময়ে। বাইয়ে সালাম বা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে বৈধ। তবে শর্ত হল মালের গুণাগুণ, শ্রেণী, প্রজাতি ও পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে কোন ধরণের অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না। মূল্য পরিশোধের মেয়াদেরও নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করতে হবে। রাসুল (স) এ সম্পর্কে বলেছেন-

من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم[১৪]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অগ্রীম মূল্য প্রদান করে সে যেন ওজন ও পরিমাণ নির্দিষ্ট করে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদান করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আওফা (রা) বলেছেন, আমরা রাসূল (স)-এর যুগে, হযরত আবু বকর ও উমর (রা) এর যুগে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতাম।

বাইয়ে মুশারাকা বা শিরকাত ঃ শিরকাত শব্দের অর্থ হল শরীক বা অংশীদারগণের অংশ। যে কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মূলধন ও লাভ লোকসানে অংশীদার হবার চুক্তিতে একত্রে কারবার পরিচালনা করে তাকে বাইয়ে মুশারাকা বা শিরকাত বলে। এ পদ্ধতিকে বাংলায় অংশীদারী বা যৌথ কারবার বলা হয়। মহানবী (স)-এর আবির্ভাবকালে আরব সমাজে এ ধরনের ব্যবসা প্রচলিত ছিল। নবুয়াত প্রাপ্তির পরও এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে রাসুল (স) অনুমোদন দিয়েছেন। এ পদ্ধতিতে ব্যবসায়ে মূলধন এবং লাভ কম-বেশি ও হতে পারে। এতে বিনিয়োগকারী অংশীদার হিসেবে কারবারের ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ করবে। লাভ হলে বিনিয়োগের অনুপাত হারে ভাগ করা হবে। কিন্তু লোকসান হলে পুঁজির অনুপাত হারে বহন করতে হবে।

---

[১৪] মিশকাত শরীফ, আরবি সংস্করণ, باب السلم و الرهن পৃ- ২৫০

Dhaka University Institutional Repository

ইজারা (اجارة) বা ভাড়া ঃ মুনাফা অর্জনের জন্য কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি স্বত্ব ত্যাগ ব্যতীত নির্ধারিত সময়ের জন্য ব্যবহার ক্ষমতা হস্তান্তর করাকে ইজারা বলে। যেমন- বাসা-বাড়ী, জায়গা-জমি, যানবাহন, বাস, ট্রাক, রিক্সা, অটোরিক্সা, (নৌকা) ইত্যাদি নির্ধারিত সময় বা কাজের জন্য নির্ধারিত মুনাফার ভিত্তিতে ইজারা দেয়া।

ইজারা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ ঃ ইজারা প্রদানের ব্যাপারে শরীয়তে বৈধ ও অবৈধতা নিয়ে ইমামগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন-

১। হাসান বসরী ও ইমাম তাউসের মতে, ভূমি ইজারা দেয়া কোনক্রমে জায়েয নেই।

২। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে ভূমি ইজারা দেয়া জায়েয নেই। তবে স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ অর্থ, নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য, কাপড় এবং অন্যান্য জিনিষের বিনিময়ে ভূমি ইজারা দেয়া জায়েয আছে।

৩। ইমাম মালেক (র)-এর মতে খাদ্যের বিনিময়ে ভূমি ইজারা দেয়া জায়েয নেই। তবে স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য জিনিষের বিনিময়ে ভূমি ইজারা দেয়া জায়েয আছে।

৪। সাহেবাইনসহ ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ অর্থ এবং ভূমি হতে উৎপাদিত ফসলের এক নির্দিষ্ট পরিমাণের বিনিময়ে ভূমি ইজারা দেয়া জায়েয আছে। [১৫]

ইজারা এর ক্ষেত্রে সাহেবাইন ও ইমাম আহমদ (র)-এর মতের উপর ফতোয়া। সর্বোপরি কথা হল ইজারা ব্যবস্থা ইসলামে বৈধ।

ইজারা বিল বাইয় ঃ এ পদ্ধতিতে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব তহবিল দিয়ে গ্রাহকের চাহিদা অনুসারে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে এবং তার কাছে এ শর্তে ভাড়া দেয় যে, গ্রাহক যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিস্তি পরিশোধ করতে পারে তবে গ্রাহক পণ্য সামগ্রীর মালিক হয়ে যাবে। আর মূল্য পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট হারে ভাড়া পেতে থাকবে।

কিস্তিতে বিক্রয় ঃ এ পদ্ধতিতে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্বল্প আয়ের লোক ও চাকুরীজীবিদের জন্য কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের চুক্তির ভিত্তিতে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী যেমন সেলাই মিশিন, খাট, আলমিরা, সোফা, রেফ্রিজারেটর, কম্পিউটার ইত্যাদি সরবাহ করে।

---

[১৫] উমদাতুল কারী, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী।

Dhaka University Institutional Repository

করযে হাসানা ঃ ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকদের বিশেষ প্রয়োজনে করযে হাসানা দিতে পারে। এরূপ লেনদেনে ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে প্রকৃত খরচ (Service charge) আদায় করে থাকে। ব্যাংকগুলো মুদারাবাহ মেয়াদী হিসাবধারীদের সাময়িক অর্থাভাব পূরণ করার জন্য মেয়াদী জমা আমানত রেখেও করযে হাসানাহ দিয়ে থাকে। ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো অবস্থা বিবেচনা করে করযে হাসানা প্রদান করতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো ইসলামী বিনিয়োগ ও ব্যবসায়ের মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। তাই ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখিত শরীয়াহ সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে অধিক পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম।

Dhaka University Institutional Repository

তাকাফুল

তাকাফুল শব্দটি কাফলুন (كفل) শব্দ থেকে গঠিত। তাকাফুল ক্রিয়ামূল যা পরস্পর লালন-পালন করা, তত্ত্বাবধান করা, পরস্পর জামিনদার হওয়া ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে আরব দেশে কোন প্রবাসী কারো জিম্মাদারীতে অবস্থান করলে ঐ জিম্মাদারকে কাফিল বলা হয়। কুরআন কারিমে লালন-পালন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত মরিয়ম (আ)-এর লালন-পালন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন- وكفلها زكريا[১৬] অর্থাৎ, এবং হযরত জাকারিয়া তাকে (মরিয়ম আঃ কে) লালন-পালন করেছেন।

মহানবী (স) হাদীস শরীফে বর্ণনা করেছেন- انا وكافل اليتيم في الجنة كهيئن الخ[১৭] অর্থাৎ, আমি ও ইয়াতিমদের লালন-পালনকারী জান্নাতে পাশাপাশি বাস করব বলে। তিনি দুটি আঙ্গুল একত্র করে সাহাবাদেরকে দেখিয়েছেন।

অধুনা ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মতে এ শব্দটি Insurance শব্দের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে আরবী শব্দ তাকাফুল ব্যবহৃত হয়।

একটি গ্রুপ বা দলের সদস্যরা একে অপরকে সাহায্য করার বা পারস্পরিক জিম্মাদারী নেয়ার কাজকে আরবিতে ''তাকাফুল' বলে। একাধিক ব্যক্তি বা গোত্রের মধ্যে শত্রুর বিরুদ্ধে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা ও সাহায্য চুক্তিকে তাকাফুল বলা হয়। পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে হতে পারে, তেমনিভাবে সামাজিকভাবে পারস্পরিক বিপদাপদ, দুঃখ দুর্দশা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও হতে পারে। ইসলামী পরিভাষাগত সাদৃশ্য বজায় রাখার জন্য একে তাকাফুল হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এ তাকাফুলকেই বাংলায় ইসলামী বীমা বলা হয়ে থাকে।

তাকাফুল বা ইসলামী বীমার মাধ্যমে একটি জনগোষ্ঠী বা জামাতের সদস্যদের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং জিম্মাদারী ইসলাম বিরোধী নয়। এটি একটি আমলে সালিহা বা নেক কাজ হিসেবে গণ্য। হঠাৎ মৃত্যু, অগ্নিকাণ্ড, চুরি, ডাকাতি, ঝড়, প্লাবন ইত্যাদির মত দুর্বিপাকে পড়ে মানুষ যখন অসহায় হয়ে যায় তখনই ইসলামী বীমাসমূহ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বীমা গ্রাহকের পাশে এসে দাড়ায়। ভাল কাজ পরস্পরকে সাহায্য

---

[১৬] আল কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত- ৩৭

[১৭] বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদাব

সহযোগিতা করার যে নির্দেশ কুরআনে দেয়া হয়েছে সে নির্দেশের আলোকেই তাকাফুল বা ইসলামী বীমার অগ্রযাত্রা।

তাকাফুল বা ইসলামী বীমা কোম্পানী ঃ তাকাফুল বা ইসলামী বীমা কোম্পানীর মৌলিক প্রকৃতি পাশ্চাত্য বীমা কোম্পানী থেকে ভিন্নতর। পাশ্চাত্য বীমা পদ্ধতি কয়েক প্রকার বা ধরনের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে মিচুয়েল বীমা কোম্পানী যে পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় তা ইসলামী বীমা পদ্ধতির কিছুটা কাছাকাছি।

ইসলামী বীমা কোম্পানী পাশ্চাত্য বীমা কোম্পানীর মত শুধুমাত্র নিরাপত্তা মূলক বীমা কোম্পানী নয়। এটি হলো পলিসি হোল্ডার এবং শেয়ার হোল্ডারদের বিনিয়োগ কোম্পানী। এ বিনিয়োগ ব্যবস্থা মৃত্যুজনিত কারণে জীবনের ক্ষতি হলে বা ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে গিয়ে সম্পত্তির ক্ষতি হলে তা পূরণের ব্যবস্থা করে। তাকাফুল এমন একটি বিনিয়োগ কোম্পানী যাতে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষতি হলে সে ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য কোম্পানীর আয়ের কিছু অংশ পৃথক করে রাখা হয়। [১৮]

পাশ্চাত্য বীমা কোম্পানীতে বিনিয়োগকারীর লক্ষ্য হল সে মারা গেলে বা আগুনে বা অন্য কোন দুর্যোগে তার সম্পত্তি বা ব্যবসার ক্ষতি হলে তার জন্য একটি বীমা বা নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থা করা। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিকে দিয়ে ইসলামী বীমা কোম্পানী পাশ্চাত্য বীমা কোম্পানী থেকে আলাদা।

তাকাফুল বা ইসলামী বীমা পদ্ধতির মূলকথা হল কয়েকজন মিলে বিশেষ আর্থিক ব্যবস্থা, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের এমন একটি পদ্ধতি পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সমবায় সমিতি চালু করা যাতে একজনের ক্ষতির সময় অন্যেরা আনুষ্ঠানিকভাবে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে পারে।

জেনারেল তাকাফুল বা সাধারণ ইসলামী বীমা ঃ ইসলামী আইনের বাস্তবায়নের ভিত্তিতে সাধারণ বীমাকেও ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালনা করা যায়। এ পদ্ধতির বীমাকে সম্পত্তি বীমা বলা হয়ে থাকে। কারণ এটি সম্পদের ক্ষেত্রেই ব্যবহার হয়ে থাকে। গাড়ী, বাড়ী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কারখানা, গুদামসহ নৌ, অগ্নিও দুর্ঘটনা ইত্যাদির ক্ষতিপূরণ দানের জন্য এ ধরনের বীমা করা হয়ে থাকে। ইসলাম পদ্ধতিতে এ ধরনের বীমার ক্ষেত্রে কোম্পানীর যাবতীয়

---

[১৮] ইসলামী ইন্স্যুরেন্স তাকাফুল, এ.জেড.এম শামসুল আলম, পৃঃ- ২৩ ;

Dhaka University Institutional Repository

খরচ, ক্ষতিপূরণ বাদে যে অর্থ সঞ্চয় হয় তা মেয়াদান্তে পলিসি গ্রহণকারীদেরকে লাভের অংশসহ ফেরত দেয়া। প্রচলিত সাধারণ বীমা ব্যবস্থায় মেয়াদান্তে ফেরত দানের কোন বিধান-ব্যবস্থা নেই। প্রচলিত বীমার ন্যায় ইসলামী সাধারণ বীমাতেও সকল দাবী পরিশোধের ব্যবস্থা আছে।

<u>বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী সাধারণ বীমা ঃ</u> বাংলাদেশে ইসলামী নামে যে সাধারণ বীমা প্রচলিত তা মূলত ইসলাম সম্মত নয়। প্রচলিত সাধারণ বীমা ও ইসলামী নামে সাধারণ বীমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রচলিত সাধারণ বীমার সকল বিধি-বিধান অনুসরণ করে জনগণের আস্থা অর্জনের জন্য ইসলামী নাম দেয়া হয়েছে।

تعاونوا على البر والتقوى অর্থাৎ, খোদাভীতি ও কল্যাণকর কাজে তোমরা পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতা কর, এ মূলমন্ত্র নিয়ে ইসলামী বীমার গঠন হলেও এদেশে ইসলামী সাধারণ বীমার কার্যক্রম এ আয়াতের পরিপন্থী।

ইসলামী সাধারণ বীমার পলিসি গ্রাহকদের (Premium) বা কিস্তির টাকা Dontion বা চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এর সকল প্রিমিয়ামের টাকা একটি হিসাবে পরিচালনা করা হয় যাকে বলা হয় PA বা Participant Account ফান্ড প্রচলিত সাধারণ বীমায় Claim বা দাবী হলেই কেবলমাত্র দাবী পরিশোধের প্রশ্ন জড়িত অন্যথায় টাকা পরিশোধের কোন প্রশ্নই আসে না। ইসলামী সাধারণ বীমার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। Claim হলেই দাবি পরিশোধ হবে আর দাবি না হলে গ্রাহককে কোন টাকাই দেয়া হয় না। ইসলামী সাধারণ বীমাতে শুধু বীমা কোম্পানী লাভবান হয়ে থাকে। গ্রাহক শোষণের শিকার হয়ে থাকে। যা ইসলাম সম্মত নয়। একজন শুধু দিয়েই যাবে আর ফিরে যাবে খালি হাতে এমনটি ইসলাম সম্মত হতে পারে না।

যদি ইসলামী সাধারণ বীমা কোম্পানীর পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হয় যে, জীবন বীমার ন্যায় Claim বা দাবি করা ছাড়াও যদি গ্রাহককে মেয়াদান্তে টাকা ফেরত দিতে হয় তাহলে বীমা কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যাবে। এ যুক্তিটি মোটেও সঠিক নয়। জীবন বীমার ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি সাধারণ বীমার ক্ষেত্রেও সে ঝুঁকি।

ধরা যাক ১০০টি গাড়ীর উপর বীমা করা হল বা ১০০টি বাড়ির উপর অগ্নি বীমা করা হল। বছর শেষে দেখা গেল যে এক বা দুটি গাড়ী দুর্ঘটনার Claim বা দাবি করা হল

Dhaka University Institutional Repository

বা এক বা দুটি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। গাড়ী দুর্ঘটনা বা অগ্নিকাণ্ডের দাবী পরিশোধের পরও বীমা কোম্পানীর হাতে বিপুল পরিমাণ প্রিমিয়ামের টাকা জমা হয়। যাতে শুধু কোম্পানীরই অধিকার অন্যান্য গ্রাহক থাকে বঞ্চিত। জীবন বীমার ক্ষেত্রে অবস্থান ভিন্ন। যেমন ১০০ জন লোকের উপর জীবন বীমা করা হল। দেখা গেল বছরে এক বা দুজন লোক মারা গেল। এক্ষেত্রে জীবন বীমা কোম্পানী মৃত্যু দাবী পরিশোধ করে। (تبرع) ফান্ড থেকে। আর অন্যান্য গ্রাহকদেরকে মেয়াদান্তে লাভসহ প্রিয়ামের টাকা ফেরত দেয়া হয়ে থাকে। জীবন বীমার ক্ষেত্রে দাবি আদায়ের পরও অন্যান্য গ্রাহকদেরকে লাভসহ প্রিমিয়ামের টাকা ফেরৎ দেয়া সম্ভব হলে সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে সম্ভব হবে না কেন?

ইসলামী সাধারণ বীমা নীতিমালার কারণে গ্রাহকগণ ফাঁকিবাজির আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্তমানে এদেশে প্রচলিত ইসলামী সাধারণ বীমার গ্রাহকগণ একথা ভাল করেই জানেন যে, Claim বা দাবী না করা হলে পরবর্তীতে কিছুই পাওয়া যাবে না। তাই অনেক গ্রাহকই এক পর্যায়ে বীমাকৃত সম্পত্তিতে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে Claim বা দাবি করে থাকে। বীমা কোম্পানী এ দাবির উপর তদন্ত করে যদি বীমাযোগ্য স্বার্থ খুজে না পায় তাহলে সে Claim বা দাবি পরিশোধ করতে অস্বীকার করে। বীমা গ্রাহক শেষ পর্যন্ত বীমার দাবি আদায়ের জন্যে আদালতেও মামলা করে থাকে। যা সমাজে বিশৃংখলার সৃষ্টি করে। যে বীমার প্রতিষ্ঠা পরস্পর সাহায্য-সহযোগিতার লক্ষ্যে,তার পরিবর্তে দেখা দেয়া শোষণ, বিশৃঙ্খলা ও ঝগড়া। যে লেন-দেন ঝগড়ার সৃষ্টি করবে তা ইসলাম সম্মত হতে পারে না। দেশে প্রচলিত ইসলামী সাধারণ বীমাকে ইসলাম সম্মত করতে নিম্ন বর্ণিত দুটি পদ্ধতির যে কোন একটি অনুসরণ করা যায়।

<u>এক ঃ</u> ইসলামী জীবন বীমার ন্যায় প্রত্যেক বীমা গ্রাহকের জন্য দুটি ফান্ড পরিচালনা করা। একটি Particepant Account ফান্ড। অপরটি তাবাররু বা অনুদান ফান্ড। তাবাররু ফান্ড থেকে Claim বা দাবি পরিশোধ করা হবে। আর মেয়াদান্তে অন্যান্য বীমা গ্রাহকগণ বীমা কোম্পানীর যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে Particepant ফান্ডে জমাকৃত প্রিমিয়ামের টাকা লাভসহ ফেরত পাবে। কোম্পানী যাতে লাভ থেকে বঞ্চিত না হয় সে কথা বিবেচনা করে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করতে হবে।

<u>দুই ঃ</u> অথবা ইসলামী সাধারণ বীমা কোম্পানী গ্রাহকের জন্য একটি হিসাব পরিচালনা করবে। Participant Account ফান্ড নামে বর্তমানে যে হিসাব পদ্ধতি আছে তাই ঠিক

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে। বার্ষিক আয়-ব্যয় হিসাবের পর যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে তার একটি অংশ কোম্পানী ফান্ড হিসেবে রেখে বাকী টাকা বীমা গ্রহিতাদেরকে ফেরত দিবে।

বীমা পরিচালনাকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট ও সব বিষয়গুলো স্বচ্ছ হতে হবে এবং তাদের হালাল হারাম সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। আমি চট্টগ্রামস্থ তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স ও বাংলাদেশ ইসলামী ইন্সুরেন্স কোম্পানীর হেড অফিসে গিয়ে বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তাদ্বয়কে তাদের কোম্পানী ইসলাম অনুযায়ী বীমা পরিচালনা করছে কিনা প্রশ্ন করলে কোন সদুত্তর দিতে পারে নাই। তারা বলেছেন ঢাকার হেড অফিস থেকে যেভাবে নির্দেশনা দেয়া হয় সেভাবেই তারা বীমার কাজ পরিচালনা করা হয়। বীমা ইসলামী বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালনা হয় কিনা তা শরিয়া বোর্ড বলতে পারবে। এ সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না।

এতে বুঝা যায় ইসলামী নিয়ম নীতি তাদের নিকট স্বচ্ছ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমা ও তাবাররুউন

ইসলামী বীমার মধ্যে দুভাবে প্রিমিয়াম বা কিস্তির অর্থ জমা দেয়া যায়। একটি হল ব্যক্তিগত মূল প্রিমিয়াম কিস্তি। আর দ্বিতীয়টি হল তাবাররুউন। যা রিস্ক বা ঝুঁকি কাভার করে।

তাবাররুউন (تبرع) শব্দের অর্থ হল দান করা বা অনুদান দেয়া।[১৯]

ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে তাবাররুউন হল একটি বিশেষ ধরনের প্রিমিয়াম বা অনুদান যা পলিসি হোল্ডার ইসলামী বীমা কোম্পানীর তাবাররুউন ফান্ডে জমা দিয়ে থাকে।

পলিসি গ্রহণকারীদের মধ্যে যদি কারো কোন দুর্ঘটনা জাতীয় ক্ষতি বা দুর্দশা ঘটে থাকে তাহলে ইসলামী বীমা কোম্পানী তাবাররুউন ফান্ডের জমাকৃত অর্থ হতে সে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে। তাকাফুল বা বীমা চুক্তিতে তাবাররুউন ফান্ডের টাকা বা পলিসি গ্রাহকগণের প্রিমিয়ামের টাকা কিভাবে বিনিয়োগ করা হবে এবং এর উপর অর্জিত লাভ কি হারে বন্টন করা হবে তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকতে হবে।

পার্টিসিপেন্ট একাউন্ট বা মূল প্রিমিয়াম একাউন্ট ঃ মালয়েশিয়া তাকাফুল আইনে পলিসি গ্রাহকদের প্রদত্ত প্রিমিয়ামের টাকা দুটি একাউন্টে জমা হয়ে থাকে। যে একাউন্টে বড় অংকের টাকা জমা হয়ে থাকে তাকে Participant Account বলে। ইসলামী বীমা গ্রাহকদের প্রিমিয়ামের সামান্য অংশ Participant Account ছাড়া অন্য যে একাউন্টে জমা হয়ে থাকে তাবাররুউন বা অনুদান একাউন্ট বলে। পার্টিসিপেন্ট একাউন্টে ইসলামী বীমা গ্রহীতার প্রিমিয়ামের প্রধান অংশটি জমা হয়। এ অংশ হতে কোম্পানী খরচ ও আনুষাঙ্গিক ব্যয় করা হয়। পার্টিসিপেন্ট একাউন্টের টাকা বিনিয়োগ হয়ে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা পার্টিসিপেন্ট একাউন্টেই জমা হয়।

তাবাররুউন ফান্ডের সামান্য অংশ বাদে বীমা গ্রহীতার প্রিমিয়ামের টাকা Participant Account এর মধ্যে জমা হবে। যদি পঁচিশ বছরের জন্য বীমা করা হয়; কিন্তু বীমা গ্রহীতা দশ বছর প্রিমিয়াম জমা দেয়ার পর মারা যায়। তবে তার Participant Account এর মধ্যে জমানো টাকা লাভসহ তার ওয়ারিশদেরকে দেয়া হবে। এটা ইসলামী

---

[১৯] আল মুনজেদ পৃঃ- ৩৪

ব্যাংকে জমা দেয়ার অনুরূপ। এ Participant Account একাউন্টে দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি পরিশোধ সংক্রান্ত কোন উপাদান নেই। দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর জন্য তার ওয়ারিসকে টাকা দেয়া হবে তা তাবাররুউন একাউন্ট থেকে দেয়া হবে। [২০]

তাবাররুউন একাউন্ট ঃ ইসলামী বীমা গ্রহীতাগণ প্রিমিয়ামের যে টাকা জমা দেয় তার একটি ক্ষুদ্র অংশ কোম্পানীর সাথে চুক্তি অনুসারে তাবাররুউন বা অনুদান একাউন্টে জমা হয়।

ইসলামী শরীয়াহ এর পরিভাষায় তাকাফুল শব্দটি বীমা এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাবাররুউন শব্দটি দ্বারা বীমার প্রিমিয়ামের অনুদান অংশকে বুঝানো হয়।

তাবাররুউন একাউন্টে যে টাকা জমা হয় তা থেকে পলিসি হোল্ডার কোন কিছুই পাবে না, যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। যাদের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনা ঘটে তারাই এ তাবাররুউন একাউন্ট থেকে সাহায্য পাবেন। যেমন ইসলামী বীমা কোম্পানীর একজন বীমা গ্রাহক লক্ষ টাকার তাকাফুল বা ইসলামী জীবন বীমা করল। পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রিমিয়াম জমা দেয়ার পর তার মৃত্যু হল। তার উত্তরাধিকারী অবশ্যই এক লক্ষ টাকা পাবে তবে এ টাকার উৎস কি?

এ এক লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হবে বীমা গ্রহীতা যে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিয়েছে তা বিনিয়োগ করে কোম্পানী দশ হাজার টাকা লাভ করেছে। তা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী তার Participant Account থেকে পেয়ে যাবে (৫০০০০ + ১০০০০) মোট ষাট হাজার টাকা। আর বাকী চল্লিশ হাজার টাকা দেয়া হবে তাবাররুউন একাউন্ট থেকে। যদি সে এক লক্ষ টাকা পুরো জমা দিতে পারতেন কোন দুর্ঘটনা না হত তাহলে মেয়াদান্তে সে এক লক্ষ টাকা মুনাফা সহ ফেরত পেত।

---

[২০] ইসলামী ইন্সুরেন্স তাকাফুল। এ.জেড.এম শামসুল আলম, পৃ:- ৫২

Dhaka University Institutional Repository

বীমার মূলনীতি

বীমার জন্য ছয়টি মূলনীতি রয়েছে। যা নিম্নরূপ-

১। চরম সদ্বিশ্বাস (Utmost good faith)

২। বীমা যোগ্য স্বার্থ (Insurable Interest)

৩। ক্ষতির পূরণ নীতি (Indemnity)

৪। স্থলাভিষিক্তকরণ নীতি (Subrogation)

৫। প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত কারণ (Proximate cause)

৬। ক্ষতি পূরণের ক্ষেত্রে অবদান (Contribution)

উল্লেখিত মূলনীতিগুলো সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।জীবন বীমার ক্ষেত্রে Utmost good faith মূলনীতিটি সরাসরি প্রযোজ্য। অন্যান্য মূলনীতিগুলোও জীবন বীমার ক্ষেত্র বিশেষ প্রযোজ্য হয়। মূলনীতিগুলো সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১। চরম সদ্বিশ্বাস (Utmost good faith) ঃ বীমা দুপক্ষের সুস্পষ্ট চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। ফলে পরস্পরকে পরিষ্কারভাবে বুঝা ও বিশ্বাস করার মাধ্যমে এ চুক্তিটি সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে সমস্ত বিষয় বীমা প্রতিনিধি বা কোম্পানীর পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে গ্রহীতার কাছে পেশ করার পর যে আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে উঠে তাই হচ্ছে বীমার প্রথম মূলনীতি। একেই বলে চরম সদ্বিশ্বাস।

২। বীমাযোগ্য স্বার্থ (Insurable Interest) ঃ বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতার বীমাকৃত বিষয় বা বস্তুর ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকে তাকেই বীমাযোগ্য স্বার্থ বলে। সাধারণ বীমার ক্ষেত্রে সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়া এবং জীবন বীমার ক্ষেত্রে বীমাগ্রহণকারীর মৃত্যুর পর অর্থনৈতিক ক্ষতি বিবেচনায় বীমাযোগ্য স্বার্থ বিবেচিত হয়।

৩। ক্ষতিপূরণ নীতি (Indemnity) ঃ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে ক্ষতির পূর্ব মুহূর্তের আর্থিক অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার যে নীতি বীমা পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয় তাই হচ্ছে ক্ষতিপূরণ নীতি বা Indemnity. ক্ষতি নিরূপণের পাকাপাকি ব্যবস্থা এখানে

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান থাকে। কোন পক্ষই যাতে বাস্তব ক্ষতি থেকে অধিক বা কম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ না থাকে।[২১]

৪। স্থলাভিষিক্ত করণনীতি (Subrogation) ঃ Subrogation এসেছে ল্যাটিন শব্দ Sub & Rogare থেকে। Sub অর্থ Under আর Rogare অর্থ to ask· Subrogation এর অর্থ হল Asking (for payment) under auother name· একটি উদাহরণ দেয়া যাক। জাহাজে পরিবহনকৃত পণ্য সামগ্রীর বীমা করল পণ্য সামগ্রীর মালিক। উক্ত বীমাকৃত পণ্য সামগ্রী ক্ষতি হল। স্বভাবতই পণ্য সামগ্রীর মালিক বীমা কোম্পানীর নিকট ক্ষতিপূরণের দাবি করল এবং বীমা কোম্পানী এ দাবী পরিশোধ করল। বিষয়টি কিন্তু এখানেই শেষ নয়। জাহাজ মালিকের আইনগত দায়িত্ব হল পণ্য সামগ্রী গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেয়া। জাহাজ মালিক তার দায়িত্ব পালন করেনি। কাজেই পণ্য সামগ্রীর মালিকের যে ক্ষতি হয়েছে জাহাজের মালিক পণ্য সামগ্রীর মালিককে সে ক্ষতিপূরণ করতে আইনগত বাধ্য। পণ্যসামগ্রীর মালিক আইনগতভাবে জাহাজের মালিকের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে। কিন্তু পণ্য সামগ্রীর মালিক এ ঝামেলায় না গিয়ে বীমা কোম্পানী থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিল। এক্ষেত্রে বীমা কোম্পানী ক্ষতি পূরণ করার আগে পণ্য সামগ্রীর মালিক তার ক্ষতিপূরণ আদায় করার অধিকার বীমা কোম্পানীকে অর্পন করবে। অর্থাৎ পণ্য সামগ্রীর মালিকের স্থলে ক্ষতিপূরণ আদায় করার দাবীদার হিসেবে বীমা কোম্পানীকে স্থলাভিষিক্ত করা হল। একেই বলা হয় স্থলাভিষিক্ত করণ নীতি বা Subrogation যে কোন দায়-দায়িত্ব বীমার ক্ষেত্রে এ নীতি প্রযোজ্য।[২২]

৫। প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ কারণ (Proximate cause) ঃ এ নীতি মূলত দাবী পরিশোধের সাথে জড়িত। একটি বীমা চুক্তিপত্রে কোন কোন কারণে ঝুঁকির উদ্ভব হলে ক্ষতিপূরণ করা হবে তা সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে। কোন দাবী উত্থাপিত হলে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, যে কারণে ক্ষতি হয়েছে সে কারণটি ক্ষতির প্রত্যক্ষ কারণ কিনা যদি সে কারণ প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে থাকে এবং তার ঝুঁকি বীমা পলিসীতে কাভার থাকে তাহলে দাবি অবশ্যই পরিশোধ যোগ্য। আর পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যে আসল কারণটি খুজে বের করা হবে তাই হবে প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ কারণ।

৬। ক্ষতি পূরণের ক্ষেত্রে অবদান (Contribution) ঃ এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষতি অনুযায়ী আর ক্ষতিপূরণ করে দেয়া। বীমা গ্রহীতা যাতে ক্ষতি থেকে বেশি না পায়, আবার বঞ্চিতও না হয় সে দিকে খেয়াল রাখা হয়। আবার মিথ্যাদাবী বা কারণ দেখিয়ে যেন বীমা কোম্পানীর ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখাই এ নীতির কাজ।

---

[২১] ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্মকৌশল, ড. আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন পঃ- ৩১

[২২] সাধারণ বীমা .আ.ক.খ. এ সামাদ, পৃ- ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমার মূলনীতি

ইসলামী বিশেষজ্ঞ ও গবেষকগণ উল্লেখিত বীমার মূলনীতিগুলো ছাড়াও ইসলামী বীমার জন্য কিছু মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণ করেছেন। তাহলো-

ক. অংশীদারিত্ব (participation)

খ. ভ্রাতৃত্ব (Brother hood)

গ. সহযোগিতা ও সমবায়নীতি (Co-Operation & Co-Asistance)

ঘ. শরীয়াহ বাস্তবায়ন (Implementation of shariah)

ঙ. ইনসাফ ও সহমর্মিতা (Adal & Ihsan)

ক. অংশীদারিত্ব (participation) ঃ ইসলামী বীমার পলিসি গ্রাহককে কোম্পানীর অংশীদার গণ্য করা হয়। ফলে সে মুদারাবা নীতির আলোকে কোম্পানীর লাভক্ষতির অংশীদার হবে।

খ. ভ্রাতৃত্ব (Brothers hood) ঃ এ নীতিটি ইসলামের একটি মৌলিক নীতি। এর মাধ্যমে বীমা গ্রহীতাগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সৃষ্টি হয় এবং একে অপরকে ভাইয়ের মর্যাদা প্রদান করে। এ ভ্রাতৃত্বের নীতি বীমা কোম্পানীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ইসলামের নীতি হচ্ছে নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করবে। হাদীসে রাসূল (স) উল্লেখ আছে-

عن انس ابن مالك (رض) قال ان رسول الله (ص) قال لا يؤمن احدكم حتي يحب لاخيه (او قال لجاره) ما يحب لنفسه[২৩]

অর্থাৎ, হযরত আনাস বিন মালিক (রা) বর্ণিত তিনি বলেছেন যে, নিশ্চয়ই রাসূল (স) বলেছেন তোমাদের মধ্যে কেউ ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্য পছন্দ করা বস্তুকে তোমার মুসলমান ভাইর (বা প্রতিবেশীর) জন্য পছন্দ না করবে।

এ নীতির ফলে ইসলামী বীমা কোম্পানী কর্তৃপক্ষও বীমা গ্রহীতাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সৃষ্টি হয়। এতে তারা পরস্পরকেএকই পরিবার ভুক্ত মনে করার সুযোগ লাভ করে।

---

[২৩] ইবনে মাজা, বাবু ফিল ঈমান

Dhaka University Institutional Repository

মূলত এনীতি হল المسلم اخو المسلم এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই এর উপর ভিত্তি করে।

গ. সহযোগিতা ও সমবায়নীতি (Co-Operation & Co-Asistance) ঃ এ নীতি একে অন্যকে সহযোগিতাও যৌথ সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিপদ-আপদ, আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি ও মানব কল্যাণ সাধনের একটি মাধ্যম। এ নীতি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে কার্যকরী ভূমিকা রাখে। ইসলামী বীমার মাধ্যমে সহজে এ লক্ষ্যে পৌছা যায়। সকলে মিলে নিজেদের জন্য সঞ্চয় ও অন্য ভাইয়ের দুর্ঘটনা জনিত বা বিপদ আপদের কারণে সংগঠিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে এর সহযোগিতার সমবায় নীতি প্রতিষ্ঠা করা যায়। ফলে কারো জন্য বোঝা হয় না। কিন্তু কারো জন্য এটি একটি মূল্যবান সহায়তা পরিণত হয়। এটিই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে স্বীকৃত তাকাফুল বা ইসলামী বীমা।

ঘ. শরীয়াহ বাস্তবায়ন (Implementation of shariah) ঃ ইসলামী শরীয়াহর মূল উৎস কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। এ চারটি সিদ্ধান্তকে শরীয়াহর সিদ্ধান্ত হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইসলামী বীমার যাবতীয় বিষয় শরীয়াহ কাঠামো অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়। সে কারণেই ইসলামী বীমগুলোকে Basied of Islamic Shariah বা শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত বলে গণ্য করা হয়। আর ইসলামী বীমার শরীয়াহ এর নীতি বাস্তবায়নে অঙ্গিকারাবদ্ধ। কোনভাবেই শরীয়াহ লংঘন করা যাবে না। শরীয়াহর ৪টি মূলনীতির যে কোন একটি প্রয়োগের মাধ্যমে বীমা এর বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা হয়। শরীয়াহ বিশেষজ্ঞ বা শরীয়াহ কাউন্সিল বোর্ড তা তদারকি করে এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

ঙ. ইনসাফ ও সহমর্মিতা (Adal & Ihsan) ঃ ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি হল ইনসাফ ভিত্তিক অর্থ বন্টনের মাধ্যমে সহমর্মিতাপূর্ণ সমাজ গঠন করা। ইসলামী বীমাও এ মূলনীতিমালার অন্তর্ভুক্ত। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনী-গরীবের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা। বিপুল জন গোষ্ঠীকে ইসলামী বীমায় সম্পৃক্ত করে তোলা। মানব কল্যাণে অবদান রাখার জন্য সহমর্মিতার হাত প্রসারিত করা। ইসলামী অর্থনীতির মাধ্যমে কোন জাতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য কেবল ইসলামী বীমা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বরং সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে বীমা ব্যবস্থার কার্যকরী ভূমিকা থাকবে। এ উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নে ইসলামী বীমার ন্যায়পরায়ণতা ও সহমর্মিতার নীতিকে গ্রহণ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সঞ্চয় ও উত্তরাধিকার

সঞ্চয় সংক্রান্ত জটিলতা : পাশ্চাত্য বীমা পদ্ধতিতে বীমাগ্রাহক যে প্রিমিয়াম জমা দেন তা সঞ্চয় হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। যদি বীমাগ্রাহক নির্ধারিত কিছু সংখ্যক কিস্তির টাকা জমা দিতে না পারে তবে তার দেয়া জমা টাকা হারাবে এবং তার বীমা বাতিল বলে গণ্য হবে। বীমাগ্রাহক যে প্রিমিয়ামের টাকা জমা দিল তা কোম্পানীর আয় বলে গণ্য হবে।

ইসলামী বীমা পদ্ধতিতে বীমা গ্রাহক যে কোন সময় প্রিমিয়াম দেয়া বন্ধ করে দিতে পারে। কিস্তির টাকা বন্ধ হলেই তার বীমা বন্ধ হয়ে যাবে না। বীমা বাতিল বলেও গণ্য হবে না। বীমা গ্রাহক যে টাকা জমা দিয়েছে তা সম্পূর্ণ এবং কোম্পানি এ টাকা বিনিয়োগ করে যে লাভ করেছে তা সহ ফেরত পাবে। কিন্তু বীমা কোম্পানী তার সার্ভিস চার্জ জমা টাকা থেকে কেটে নিবে।

কিন্তু আমাদের দেশে কোন ইসলামী বীমা কোম্পানীই এ বিধান পুরোপুরি পালন করে না। যে কেউ প্রথম দু তিনটি প্রিমিয়াম জমা দিল বা দুবছরের কম প্রিমিয়াম জমা দিয়ে আর দিতে পারল না। তাহলে আমাদের দেশের ইসলামী বীমা কোম্পানীও বীমা গ্রহীতাকে কোন টাকাই ফেরত দেয় না। যা সম্পূর্ণ ইসলামী পরিপন্থী।

তবে সে তাবাররুউন একাউন্টে বা অনুদান ফান্ডে যা জমা দিয়েছে তা ফেরত পাবে না। কারণ সে তো তা অন্য ভাইয়ের বিপদকালীন সময়ে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থাপনায় দান করেছে। তার দানের টাকা ফেরত নেয়া ইসলামের বিধান নয়। হাদিসে রাসূল (স) উল্লেখ আছে-

عن عبد الله بن عمر وابن عباس (رض) قالا ان رسول الله (ص) قال لا يحل لرجل ان يعطي عطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي اعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب اكل حتي اذا شبع قاء عاد في قيئة.[২৪]

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত তারা উভয়ে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন কোন ব্যক্তির জন্য জায়েয হবে না দান করে তা আবার ফিরিয়ে নেয়া। কিন্তু পিতা যদি সন্তানকে কোন কিছু দান করেন প্রয়োজন হলে তা

---

২৪ মিশকাত শরীফ, বাবুল হিবাহ। পৃ:- ২৬০

Dhaka University Institutional Repository

আবার ফেরত নিতে পারেন। (অন্য কারো ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য নয়)। আর দান করে যে তা আবার ফিরিয়ে নেয় তার উদাহরণ হল এমন কুকুরের ন্যায় যে কুকুর পেট পূর্ণ করে খেয়ে বমি করে,আবার ঐ বমিকে খেয়ে ফেলে।

এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় তাবাররুউন (অনুদান) একাউন্টে যে টাকা জমা হবে তা বীমা গ্রহীতা ফেরত নিতে পারবে না।

পাশ্চাত্য বীমা ব্যবস্থায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বীমা গ্রাহকদেরকে কিছুটা সুবিধা দিয়ে থাকে।

বর্তমানে বহুদেশেই বীমার নির্দিষ্ট সংখ্যক কিস্তি দেয়ার পর পরবর্তী কিস্তি দিতে না পারলেও পুরো বাদ যায় না। বীমা গ্রাহককে প্রদত্ত টাকা বা অংশ বিশেষ নির্দিষ্ট সময় পর ফেরত দেয়া হয়। তাতেও কয়েক বছর পর্যন্ত বীমা গ্রহীতা বীমার কিস্তি হিসেবে প্রদত্ত টাকা ফেরত পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। আর যখন ফেরত পায় তখন তার জমা দেয়া টাকা ও এর সুদসহ যে পরিমাণ টাকা পাওয়ার কথা তা থেকে অনেক কম পেয়ে থাকে। [২৫]

তাকাফুল বা ইসলামী বীমা পদ্ধতি অনুসারে বীমা গ্রহীতা তাবাররুউন বা অনুদান খাত ছাড়া যে টাকা জমা দিয়েছে তা থেকে কোন প্রকারেই বঞ্চিত হবে না। কিন্তু কোম্পানীর প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা খরচ পলিসি হোল্ডারকে বহণ করতে হবে। আর এ দের অর্থ জমা টাকা ও মুনাফা থেকে কেটে নেয়া হবে। অন্য কথায় প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা খরচ বাদ দিয়ে কিস্তি হিসেবে জমা টাকার উপর মুনাফাসহ বীমা গ্রহীতা ফেরত পাবে।

বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো কিস্তি চালাতে অক্ষম বীমা গ্রাহকদের থেকে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা খরচ নাম দিয়ে প্রদেয় কিস্তির টাকা সিংহ ভাগ কেটে রেখে দেয়া। যা কোন ভাবে মেনে চলা যায় না।

ইসলামী বীমা কোম্পানীতে পলিসি হোল্ডারগণ কিস্তি দিতে অক্ষম হলে বা অন্য কোন কারণে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে যাতে বঞ্চিত না হয় তা দেখার জন্য ব্যবস্থাপনা বোর্ডে পলিসি হোল্ডারদের প্রতিনিধিও থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য বীমা ব্যবস্থায় এ সুযোগ নেই।

---

[২৫] ইসলামী ইন্সুরেন্স (তাকাফুল) এ. জেড. এম শামসুল আলম, পৃ- ৭৭

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত জটিলতা ঃ পাশ্চাত্য বীমা পদ্ধতিতে বীমার উপকারীতা পাবে বীমা গ্রাহক নিজে যদি তিনি জীবিত থাকেন৷ আর বীমা গ্রাহক মৃত্যুবরণ করলে সম্পূর্ণ সুবিধা পাবে বীমা গ্রাহকের নমিনী। নমিনী ছাড়া আইনগত উত্তরাধিকারী কিছুই পাবে না।

ইসলামী শরীয়াহ মতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে শরীয়াহ আইন অনুযায়ী বন্টিত হবে। জীবিত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ যাকে ইচ্ছা করে দান করে যেতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর পর যা রেখে যাবে তা ইসলামী আইন অনুসারেই উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হবে।

দান বা অসিয়ত ঃ যে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তার উপর যদি কোন ঋণ থেকে থাকে তা প্রথমে শোধ করা হবে। ঋণ শোধ করার পর মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় যদি কাউকে কোন কিছু দান করে যায় বা তার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে কোন ব্যক্তিকে কিছু দান করতে নির্দেশ করে যায় তাহলে সে অসিয়ত (নির্দেশ) পূরণ করার পর বাকী সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন-

فان كان له اخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها اودين[২৬]

অর্থাৎ, অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে তবে তার মাতা পাবেন ছয় ভাগের একভাগ। অছিয়ত (দানের নির্দেশ) পূরণ করার পর বা ঋণ থেকে থাকলে তা পরিশোধ করা হবে।

فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها اودين[২৭]

অর্থাৎ, যদি তোমাদের স্ত্রীদের সন্তান থাকে তবে তোমরা তার (স্ত্রীর) রেখে যাওয়া সম্পদের একচতুর্থাংশ পাবে। তাদের অছিয়ত (দানের নির্দেশ) পূরণ করার পর বা ঋণ থেকে থাকলে তা পরিশোধ করার পর।

ইসলামে দান করার অধিকার দিলেও যেচ্ছা তাই দান করার অনুমতি দেয়া হয় নাই। সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ দান করতে পারবে। এ সম্পর্কে হাদীসে রাসূল (স) ইরশাদ করেন-

---

[২৬] আল কুরআন সূরা আন-নেসা, আয়াত- ১১

[২৭] আল কুরআন সূরা আন-নেসা, আয়াত- ১২

Dhaka University Institutional Repository

عن عامر بن سعد بن ابي وقاص (رض) قال مرضت بمكة مرضا فاشفيت منه علي الموت فاتاني النبي (ص) يعودني فقلت يا رسول الله (ص) ان لي ما لا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي فاتصدق بثلثي مالي! قالا لا. قال قلت الشطر قال لا. قلت الثلث؟ وقال الثلث كثير ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس.[১৮]

অর্থাৎ, হযরত আমের ইবনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন এক সময় আমি মক্কাতে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছি, এমনকি মৃত্যুর আশঙ্কা করেছি। অতঃপর রাসূল (স) আমাকে দেখতে আসলেন। আমি রাসূল (স)-কে বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমার অনেক সম্পদ আছে অথচ আমার উত্তরাধিকারী মাত্র দুটি কন্যা সন্তান। আমি কি আমার সমুদয় সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দান করে দিব কি? উত্তরে রাসূল (স) বললেন না। তিনি আবার বললেন তাহলে অর্ধাংশ? এবারও রাসূল (স) বললেন না। তিনি আবার বললেন তা হলে এক তৃতীয়াংশ? রাসূল (স), এক তৃতীয়াংশ হলেও অনেক। রাসূল (স) আরো বললেন তুমি তোমার সন্তানকে মানুষের নিকট হাত পাতার মত দরিদ্র রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী বা অন্যের মুখাপেক্ষীহীন করে রেখে যাওয়া অনেক উত্তম।

সুদী বীমাতে কোন গ্রাহক ২৫টি কিস্তি দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে ১৫টি কিস্তি দেয়ার পর মারা গেল। গ্রাহকের ২৫টি কিস্তির পরিমাণই বীমা কোম্পানী তার নমিনীকে প্রদান করবে। আর নমিনী ব্যক্তি নমিনী হওয়ার সুবাদে ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার ২৫টি কিস্তির টাকার মালিক বনে গেল।

ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় নমিনী এককভাবে ২৫টি কিস্তির টাকার মালিক হতে পারবে না। ইসলামী বীমা কোম্পানী মৃত ব্যক্তির সকল ওয়ারিশদের মধ্যে উক্ত টাকা ইসলামী উত্তরাধিকারী আইন অনুযায়ী বন্টনের কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মৃতব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত নমিনী যদি তার ওয়ারিশদের মধ্য থেকে কেউ না হয় তাহলে উক্ত নমিনী সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশের অধিকারী হবে। এর বেশি তাকে দেয়া হবে না। আর যদি নমিনী ওয়ারিশদের মধ্য থেকে কেউ হয়ে থাকে তা হলে শরীয়াহ আইন অনুযায়ী সে যে পরিমাণ প্রাপ্য কোনভাবেই তার বেশী পাবে না।

---

[১৮] সহীহ বুখারী কিতাবুল ফারায়েয

Dhaka University Institutional Repository

এ নীতিমালার মাধ্যমে ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় কোনভাবেই মিরাসী আইন লংঘিত হয় না। বরং মিরাসী আইন যথার্থভাবে প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা। ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় কোন গ্রাহক মৃত্যুবরণ করলে তা রেখে যাওয়া বীমা সম্পত্তিতে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক ফারায়েজ হেবা, ওয়াকফ ও করজে হাসানা এ সকল বিষয় বিবেচনা করে বীমাকৃত সম্পদ বন্টন করা হয়।

404148

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমা ও সূদী বীমার মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী বীমা (তাকাফুল) ও পাশ্চাত্য সূদী বীমা পারস্পরিক সহযোগিতা মূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধারণা করা হলেও এ উভয় ব্যবস্থার মধ্যে অনেক পার্থক্য নিহিত রয়েছে। যেমন-

মালিকানা বিষয়ক পার্থক্য ঃ ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় পলিসি হোল্ডারগণ ও বীমা কোম্পানীর মালিক হিসেবে গণ্য। সূদী বীমায় পলিসি হোল্ডারগণ মালিক হিসেবে গণ্য হয় না। সূদী বীমায় কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারগণ লাভ যত বেশী হয় তা তারাই ভোগ করে,অপর দিকে লোকসান হলে তাও তাদের উপর বর্তায়। কিন্তু ইসলামী বীমা মুদারাবাহ পদ্ধতিতে পরিচালিত হলে পলিসি হোল্ডারগণ কোম্পানীর লাভ-লোকসানের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। লাভের একটি অংশ তাদেরকে দেয়া হবে এবং লোকসানের একটি অংশ ও তাদেরকে বহন করতে হবে।

জমা হিসাব বিষয়ক পার্থক্য ঃ সূদী বীমাতে শেয়ার হোল্ডারদের জমা টাকার হিসাব এবং পলিসি হোল্ডারদের জমা টাকার হিসাব আলাদা করে রাখা হয় না এবং পলিসি হোল্ডারগণকে কোম্পানীর মালিক মনে করা হয় না। সূদী বীমাতে লাভ-লোকসানের সম্পূর্ণ মালিক কোম্পানী। পলিসি হোল্ডারদেরকে নির্দিষ্ট একটি পার্সেনটিজ দেয়া হয়। কিন্তু ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় শেয়ার হোল্ডারদের জমা দেয়া টাকার হিসাব এবং পলিসি হোল্ডারদের জমা টাকার হিসাব আলাদা করে রাখা হয়। শেয়ার হোল্ডারগণ এক অর্থে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মালিক। পলিসি হোল্ডারদের আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে তারা বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করে থাকে। বীমা ব্যবসায়ের মাধ্যমে পলিসি হোল্ডারদের কল্যাণ সাধন করার পর যে লাভ হবে তা শেয়ার হোল্ডারদের অংশ অনুযায়ী বন্টন করে দেয়া হবে। কিন্তু ইসলামী বীমায় পলিসি হোল্ডারগণ ও বীমা কোম্পানীর মালিক হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

শরীয়াহ নীতি বিষয়ক পার্থক্য ঃ ইসলামী বীমা ও সূদী বীমার মধ্যে সর্বপ্রধান পার্থক্য হল যে, ইসলামী বীমা শরীয়াহ সম্মতভাবে পরিচালিত। আর অন্যটি সুদ ভিত্তিক শরীয়াহ বিরোধী নীতিতে পরিচালিত। ইসলামী বীমা কোম্পানীর শরীয়াহ নীতিমালা তদারকির জন্য একটি শরীয়াহ কাউন্সিল বা বোর্ড থাকে। এ বোর্ড বীমা কোম্পানীকে বীমা কার্যক্রমে শরীয়াহ নীতি বাস্তবায়নে বাধ্য করে। সূদী বীমাতে যা কল্পনা করাও যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ বিষয়ক পার্থক্য ঃ ইসলামী বীমা কোম্পানী একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিপদ-আপদে আর্থিক ক্ষতিপূরণের অঙ্গিকার নিয়েই এ কোম্পানী গঠিত হয়। ইসলামী বীমা কোম্পানী বিভিন্ন খাত থেকে প্রাপ্ত অর্থ ইসলামের বৈধ খাতসমূহে বিনিয়োগ করে থাকে। সুদী বা প্রতারণামূলক কোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবেনা। কিন্তু সুদী বীমা কোম্পানী যে কোন ভাবেই বিনিয়োগ করে লাভ আদায় করে থাকে। হালাল ও হারামের কোন বিষয় চিন্তা করে না।

সন্দেহযুক্ত আয় ঃ পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদের উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত। তাই পাশ্চাত্য বীমা ব্যবস্থায় ও সুদী পন্থায় আয় আসে আবার ইসলাম বিরোধী পদ্ধতিতে তা ব্যয় হয়ে থাকে।

সুদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার কারণে ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় যে সন্দেহযুক্ত আয় এসে থাকে তা কোম্পানী তার হিসাবের মূল ধারার সাথে সংযুক্ত করতে পারবে না। সন্দেহযুক্ত আয় পৃথক তহবিলে রাখতে হবে এবং জনকল্যাণ কর্ম্ম কাজে ব্যয় করতে হবে।

বীমার উদ্দেশ্যে বিষয়ক পার্থক্য ঃ পাশ্চাত্য বীমার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যমে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে কম দেয়া এবং বেশী লাভ করাই হল সুদী বীমা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। এতে হালাল হারামের কোন ভেদাভেদ নেই। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে কম ক্ষতিপূরণ দিয়ে লাভ বা মুনাফা করা ইসলামী বীমার উদ্দেশ্য নয়। সুদী বীমা কোম্পানীর লক্ষ্য হল কোম্পানীর মালিক বা শেয়ার হোল্ডারদের জন্যে মুনাফা অর্জন। এ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্য ঠিক রেখে সুদী বীমা কোম্পানী বহু অনৈতিক কার্যক্রমে লিপ্ত হয়। পলিসি হোল্ডারদের ক্ষতি হলেও সে ক্ষতিপূরণের টাকা থেকে যা কম দিতে পারে চেষ্টা করে। ন্যায্য ক্ষতিপূরণের টাকা না পেয়ে পলিসি হোল্ডারদেরকে আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। পাশ্চাত্য বীমা চুক্তির কোন পক্ষই সাওয়াবের নিয়তে এবং হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য বীমা করে না। বীমা শুধু হয়ে থাকে নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। যতটুকু ক্ষতি হয়েছে তার বেশী কম করা যে পাপ এ ধরনের চেতনা বোধ সুদী বীমায় সংশ্লিষ্ট কারো মধ্যে থাকে না।

অপর দিকে ইসলামী বীমা হবে তাকাফুল ভিত্তিক। এতে পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতামূলক দায়িত্বশীল হয়ে থাকে। অন্যের বিপদ-আপদে উপকার ও তাকওয়া ভিত্তিক সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে নেকি বা পুণ্য অর্জনই হয়ে থাকে ইসলামী বীমার মূল লক্ষ্য।

Dhaka University Institutional Repository

কারো ক্ষতি হলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য সহযোগিতা করা করব। সমবায় বীমা ইসলামে অনুমোদিত। ভালকাজে প্রতিযোগিতা করা ইসলামে বৈধ।

আলঘারার (الغـــرر) ঃ সুদী বীমা ব্যবস্থায় গ্রাহকদেরকে মিথ্যা ও বিভিন্ন লোভনীয় অশ্বাস দিয়ে গ্রাহকদের মনযোগ আকর্ষণ করে থাকে। গ্রাহক পলিসি গ্রহণ করার পূর্বে বীমা কোম্পানীর কর্মকর্তারা সময়ে অসময়ে যেখানেই সম্ভব বীমা পলিসি গ্রহণকারী ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকে। বীমা পলিসি গ্রহণে শুধু উদ্বুদ্ধই করে না; বরং বীমা গ্রহণে বাধ্য করে। কিন্তু পলিসি হোল্ডারগণ যখন দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন পূর্বের সেই কর্মকর্তাগণ ভিন্ন দিকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নেন। যতটুকু সম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ পরিহার করে চলে। একেই আলঘারার বা প্রতারণা বলা হয়।

অন্য দিকে ইসলামী বীমাতে আল ঘারারের কোন স্থান নেই। বীমা কর্মকর্তাগণ কোম্পানীর দেয়া বৈধ সুযোগ সুবিধা বীমা গ্রাহকের নিকট উপস্থাপন করবে। অতিরিক্ত বা মিথ্যা কোন আশ্বাস বীমা গ্রাহককে দিতে পারবে না। কোন বীমা গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। কারণ ক্ষতিপূরণের সহযোগিতা মূলক অঙ্গিকার নিয়েই ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠা।

মুনাফা অর্জন বিষয়ক পার্থক্য ঃ সুদী বীমা ব্যবস্থায় বীমা গ্রাহকের সাথে চুক্তির সময়ই কত লাভ দেয়া হবে তা নির্ধারিত থাকে। গ্রাহকের চাহিদা পূরণ করতে কোম্পানীকে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ অর্জন করতেই হবে। তাই সুদী বীমা কোম্পানী যে কোন পন্থায়ই হোক মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে থাকে।

ইসলামী বীমাতে বীমা গ্রাহকদের সাথে চুক্তির সময় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভের উল্লেখ থাকে না। ইসলামী বীমা পদ্ধতিতে ব্যবসা হবে মুদারাবাহ ভিত্তিক। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করে এবং অপর পক্ষ মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে স্বীয় মেধা ও শ্রম দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে এবং চুক্তির মাধ্যমে মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয় এবং ক্ষতি হলে সকল পক্ষই এর ভাগ নিতে বাধ্য থাকে।

ইসলামী বীমায় বীমা কোম্পানী হল মুদারিব আর পলিসি গ্রাহক হল সাহেবুল মাল বা সম্পদের মালিক।

Dhaka University Institutional Repository

প্রিমিয়াম বা কিস্তির টাকা জমা বিষয়ক পার্থক্য ঃ ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় বীমা গ্রাহকগণ তাদের প্রিমিয়াম বা কিস্তির টাকা Participant Account বা ব্যক্তিগত নিজস্ব একাউন্ট ও তাবাররুউন বা অনুদান একাউন্টে জমা দিয়ে থাকে। প্রিমিয়ামের অধিক অংশ Participant Account এর মধ্যে জমা হয়ে থাকে। আর প্রিমিয়ামের সামান্যতম অংশ তাবাররুউন বা অনুদান একাউন্টে জমা হয়ে থাকে। কোন গ্রাহক দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাবাররুউন একাউন্ট থেকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়ে থাকে। এ জন্যে এখানে সুদের কোন সুযোগ থাকে না। অন্য দিকে সুদী বীমা ব্যবস্থায় গ্রাহকদের প্রিমিয়ামের টাকা ব্যবসায়ী অধিকারের ভিত্তিতে একটি একাউন্টেই জমা হয়ে থাকে। কোন গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হলে বীমা কোম্পানী তা বহন করে থাকে। যা সুদের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

বীমা অধিকার বাতিল বিষয়ক পার্থক্য ঃ ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় কয়েকটি প্রিমিয়াম জমা দেয়ার পর যদি আর না দেয় তাহলে তার বীমা বাতিল হয়ে যায় না। যে কোন সময় তা পুনঃ চালু করা যায়।

সুদী বীমা ব্যবস্থায় কয়েকটি বীমা কিস্তি জমা দেয়ার পর যদি আর না দেয় তা হলে নির্দিষ্ট একটি সময় পার হওয়ার পর তার পলিসি বাতিল হয়ে যাবে।

সমর্পণ মূল্য প্রদান বিষয়ক পার্থক্য ঃ ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় মেয়াদ পূর্তির পূর্বে যদি কোন গ্রাহক কিস্তি চালাতে অক্ষম হয় বা কিস্তির টাকা জমা না দেয় তাহলে বীমা গ্রাহকের Participant Account ফান্ডে জমাকৃত টাকা সার্ভিস চার্জ কর্তনের মাধ্যমে ফেরত দানের লক্ষ্যে মুদারাবাহ নিয়মে নির্ধারণ করা হয়।

সুদী বীমা ব্যবস্থায় মেয়াদ পূর্তির পূর্বে প্রিমিয়াম দিতে অক্ষম হলে বা না দিলে বীমা গ্রাহককে কোন সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করা হয় না। জমাকৃত প্রিমিয়ামের টাকা কোম্পানীর লাভ হিসেবে গণ্য হবে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বেতন প্রদান বিষয়ক পার্থক্য ঃ ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় বীমা কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে কোম্পানীর পক্ষ হতে বেতন ভাতা প্রদান করতে হবে। আদায়কৃত প্রিমিয়াম থেকে কোন প্রকার কমিশন প্রদান করা যাবে না।

Dhaka University Institutional Repository

সুদী বীমা ব্যবস্থায় বীমা কোম্পানী কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বেতন প্রদান করে না। আদায়কৃত প্রিমিয়াম থেকে বেতন বাবদ কমিশন প্রদান করে। এজন্য কোন গ্রাহক প্রিমিয়াম জমা দিলে তার সিংহভাগ কর্মকর্তাও কর্মচারীদের কমিশন বাবদ চলে যায়।

বীমা আইনের উৎস বিষয়ক পার্থক্য ঃ ইসলামী বীমা আইনের উৎস হল কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস ভিত্তিক। সুদী বীমার উৎস হল মানুষের তৈরি প্রচলিত আইন ও বিধান।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের প্রচলিত ইসলামী বীমার তালিকা

সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ মানুষকে কাংখিত অর্থনৈতিক মুক্তি দানে ব্যর্থ হলে বিশ্বের মানুষ ইসলামী অর্থনীতি গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠে। ১৪ শত বছর পূর্বে রাসূল (স) যে অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন তা নিরংকুশ মানব কল্যাণে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি মজবুত করে। ধনী-গরীবের মাঝে দূরত্ব কমিয়ে দেয়। তাই মানুষ আজ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকতে শুরু করছে। গত দুদশক পূর্বে আধুনিক ইসলামী বীমা যাত্রা শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্রুত প্রসার ঘটে।

বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী বীমার তালিকা

ক্রমিক	কোম্পানীর নাম	দেশের নাম	প্রতিষ্ঠা সাল
১	আল-সালাম ইসলামী তাকাফুল কোম্পানী	বাহরাইন	১৯৯২
২	বাহরাইন ইসলামিক ইন্সিওরেন্স কোম্পানী	বাহরাইন	১৯৯২
৩	ইসলামিক ইন্সিউরেন্স এন্ড হ্সিউরেন্স কোম্পানী	বাহরাইন	১৯৮৫
৪	শিয়ারিকাত তাকাফুল আল ইসলামিয়া	বাহরাইন	১৯৮৩
৫	তাকাফুল ইন্টারন্যাশনাল	বাহরাইন	১৯৮৯
৬	ইসলামিক ইন্সিউরেন্স কোম্পানী	জর্ডান	১৯৮৯
৭	ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানী ফর কো-অপারেটিভ ইন্সিউরেন্স	কুয়েত	১৯৮৯
৮	কাতার ইসলামিক ইন্সিউরেন্স কোম্পানী	কাতার	১৯৯৪
৯	আল আমানাহ কো-অপারেটিভ ইন্সিউরেন্স	সৌদি আরব	১৯৮৫
১০	গ্লোবাল ন্যাশনাল ইন্সিউরেন্স কোম্পানী	বাহরাইন	১৯৮৫
১১	ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইন্সিউরেন্স কোম্পানী	সৌদি/সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৯৮৫
১২	ইসলামিক আরব ইন্সিওরেন্স কোম্পানী	সৌদি আরব	১৯৭৯

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	কোম্পানীর নাম	দেশের নাম	প্রতিষ্ঠা সাল
১৩	ইসলামিক কর্পোরেশন ফর ইন্সিউরেন্স অব ইনভেস্টমেন্ট এ্যান্ড ক্রেডিট	সৌদি আরব	১৯৯৫
১৪	দি ইউনাইটেড ইন্সিউরেন্স কোম্পানী	সুদান	১৯৬৮
১৫	ইসলামিক ইন্সিউরেন্স কোম্পানী	সুদান	১৯৭৯
১৬	শাইখান ইন্সিউরেন্স কোম্পানী	সুদান	১৯৭৯
১৭	দি ন্যাশনাল রি-ইন্সিউরেন্স কোম্পানী	সুদান	১৯৭৯
১৮	দি ইসলামিক আরব ইন্সিউরেন্স কোম্পানী	সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৯৮০
১৯	ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী	সৌদি আরব	১৯৮৬
২০	ইসলামিক ইউনিভার্সাল ইন্সিউরেন্স	সৌদি আরব	১৯৮৩
২১	ইসলামিক তাকাফুল এন্ড রি-তাকাফুল কোং	বাহামা	১৯৮৩
২২	আল বারাকা ইন্সিউরেন্স	সুদান	১৯৮৪
২৩	ইসলামিক ইন্সিওরেন্স রি-ইন্সিউরেন্স কোং	সৌদি আরব / বাহরাইন	১৯৮৫
২৪	ইসলামিক ইন্টার ইন্সিউরেন্স কোম্পানী	সৌদি/সংযুক্ত আরব আমিরাত	১৯৮৫
২৫	বিআইটি লাদাত ইন্টামিন টুনসি সৌদি	তিউনিসিয়া	১৯৮৫
২৬	ইসলামিক তাকাফুল এন্ড তাকাফুল কোং বাহরাইন	সৌদি আরব	১৯৮৬
২৭	তাকাফুল ইসলামিক ইন্সিউরেন্স কোং	সৌদি/বাহরাইন	১৯৮৬
২৮	এলায়েন্স ইন্সিউরেন্স	সংযুক্ত আরব	১৯৮৫
২৯	ওমান ইন্সিউরেন্স কোম্পানী	সংযুক্ত আরব	১৯৮৫
৩০	ওয়াতানিয়াহ কো-অপারেটিভ ইন্সিউরেন্স কোঃ	সুদান	১৯৮৯
৩১	ইন্সিউরেন্স ইসলাম টি এ আইবি বারহাদ (আই আই টিএসবি)	ব্রুনাই	১৯৯৩

ক্রমিক	কোম্পানীর নাম	দেশের নাম	প্রতিষ্ঠা সাল
৩২	তাবুং আবানাহ ইসলাম	ব্রুনাই	১৯৯৩
৩৩	তাকাফুল এন্ড রি তাকাফুল কোম্পানী	ব্রুনাই	১৯৯৩
৩৪	তাকাফুল আল বারহাদ	ব্রুনাই	১৯৯৩
৩৫	তাকাফুল ন্যাশনাল বারহাদ	মালয়েশিয়া	১৯৯৩
৩৬	ইখলাস মিগুরটা (এ এস)	মালয়েশিয়া	১৯৯৩
৩৭	শিয়ারিকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া বারহাদ	মালয়েশিয়া	১৯৯৪
৩৮	আশিয়ান তাকাফুল গ্রুপ	মালয়েশিয়া	১৯৯৬
৩৯	এশিয়ান রি-তাকাফুল ইন্টারন্যাশনাল	মালয়েশিয়া	১৯৯৭
৪০	শিয়ারিকাত তাকাফুল ইন্দোনেশিয়া	ইন্দোনেশিয়া	২০০০
৪১	পিটি আশুরানশি তাকাফুল কেলোয়ারগা	ইন্দোনেশিয়া	২০০০
৪২	পিটি আশুরানশি তাকাফুল উলুম	ইন্দোনেশিয়া	২০০০
৪৩	পিটি শিয়ারিকাত তাকাফুল	ইন্দোনেশিয়া	২০০০
৪৪	তাকাফুল আশুরানশি	ইন্দোনেশিয়া	২০০০
৪৫	মেট্রো পলিটন ইন্সিউরেন্স কোং	ঘানা	
৪৬	সোসাল আল আমিন	সেনেগাল	

বাংলাদেশে ইসলামি ইন্সিউরেন্স কোম্পানীসমূহ ঃ

১। হোমল্যান্ড লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লিঃ (তাকাফুল প্রকল্প) ১৯৯৮

২। ফারইস্ট ইসলামি লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লিঃ ২০০০

৩। তাকাফুল ইসলামী ইন্সিউরেন্স কোং লিঃ ২০০০

৪। ইসলামী ইন্সিউরেন্স বাংলাদেশ লিঃ ২০০০

Dhaka University Institutional Repository

৫। প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সিউরেন্স ২০০১

৬। ইসলামী কমার্সিয়াল ইন্সিউরেন্স লিঃ ২০০১

৭। মেঘনা লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লিঃ (তাকাফুল প্রকল্প) ২০০১

৮। পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লিঃ ২০০১

৯। রূপালী লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লিঃ (তাকাফুল প্রকল্প) ২০০১

১০। সানলাইফ লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লিঃ (তাকাফুল) ২০০১

১১। পপুলার লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী লিঃ ২০০১

অমুসলিম দেশে ইসলামী লাইফ ইন্সিউরেন্স কোম্পানী সমূহের তালিকাঃ-

১। ফায়লাকা ইনভেস্টমেন্ট ইন্সিউরেন্স	- যুক্তরাজ্য	১৯৯৬
২। তাকাফুল ইউ,এস,এ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস	- যুক্তরাজ্য	১৯৯৬
৩। তাকাফুল এস,এ.	- লুক্সেমবার্গ	১৯৮২
৪। তাকাফুল টি এন্ড টি	- ত্রিনিদাদ	১৯৮২
৫। তাকাফুল ইউকে লিঃ	- যুক্তরাজ্য	১৯৮২
৬। তাকাফুল অস্ট্রেলিয়া	- অস্ট্রেলিয়া	
৭। ইন্টারন্যাশনাল তাকাফুল কোম্পানী	- লুক্সেমবার্গ	
৮। এগ্রোহোল্ডিং সিংগাপুর সিটি লিঃ	- সিঙ্গাপুর	১৯৯৫
৯। কোপল ইন্সিউরেন্স	- সিঙ্গাপুর	১৯৯৫
১০। দি শিয়ারিকাত তাকাফুল	- সিঙ্গাপুর	১৯৯৫
১১। ইউকেবি	- যুক্তরাজ্য	১৯৯৮
১২। আমানাহ শ্রীলংকা	- শ্রীলংকা	১৯৯৯
১৩। তাকাফুল টি এন্ড টি ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটি	- ত্রিনিদাদ টোবাগো	১৯৯৯

উল্লিখিত তালিকা ছাড়াও এমন অনেক কোম্পানী আছে যারা তাকাফুল প্রকল্প চালু করে ইসলামী ইন্সিউরেন্স কাজ শুরু করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামী বীমার সমস্যা ও সমাধান

আমাদের দেশে ইসলামী বীমার ধারণা নতুন হলেও প্রচলিত বীমার ধারণা নতুন নয়। এদেশে ইসলামী বীমার প্রসার হলেও কিন্তু কাংখিত মানে পৌছতে বিভিন্নভাবে বাধার সম্মুখিন হয়। এদেশে ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান বাধা অতিক্রম করে ইসলামী বীমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। (১) ধর্মীয় দৃষ্টি কোন থেকে মুল্যায়ন (২) দক্ষ জনশক্তির অভাব (৩) দেশের প্রচলিত আইনের বাধা।

প্রথমত: ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন ঃ বাংলাদেশের মানুষ মানসিকতায় ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন হলেও ধর্মীয় জ্ঞান সম্পন্ন নয়। অন্যদিকে সমস্যা হল যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন আমদানী রপ্তানী করেন। শিল্প প্রতিষ্ঠা করে শিল্পজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন ও বাজারজাত করেন, তারা ব্যবসা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন কিন্তু তাদের কোরআন, সুন্নাহ, ফিকহ্ এর জ্ঞান নেই। তাই তাদের ব্যবসা নিজেদের ধ্যান-ধারণা মাফিক পরিচালিত হয়ে থাকে। ইসলাম ভিত্তিক হয় না। আবার যারা কুরআন, হাদীস ও ফিকহ্ জানেন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠা পণ্য উৎপাদনের কলা-কৌশল সম্পর্কে মোটেও জ্ঞান নেই। তাই আমাদের দেশে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ইসলামী ধাচে গড়ে উঠা কঠিন হয়ে পড়ে।

পাশ্চাত্য শিক্ষিতদের ইসলামী জ্ঞান সম্বন্ধে অবহেলা এবং ইসলামী শিক্ষিতদের ব্যবসা বাণিজ্যের কলা-কৌশল, নিয়ম-পদ্ধতি বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে অনভিজ্ঞতার কারণে আধুনিক জটিল বিষয়গুলোতে শরিয়তভিত্তিক সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশেষ বেশ কিছু ইসলামী গবেষক ও আলিম ওলামা ইসলামী ব্যাংকিং এবং ইসলামী বীমাকে সুদী ব্যাংকিং এবং সুদি বীমার নতুন সংস্করণ মনে করেন। কিছু আলিম উলামা

জুয়ার সাথে বীমা এর মিল খুঁজে পান। কেউ মনে করেন বিদআত। কেউ মনে করেন এটা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। এতে জন সাধারণের মাঝেও ইসলামী বীমা সম্পর্কে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। এ সমস্যা উত্তরণের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বীমা সম্পর্কে দ্বীনি শিক্ষিত ও আধুনিক শিক্ষিত লোকের যৌথ আলোচনা ও গবেষণার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্বে বীমা সম্পর্কে ইসলামী গবেষকদের মতামতঃ-

এক ঃ বীমা ব্যবস্থা সুদ, জুয়া ও গারার পূর্ণ। তাই বীমা ব্যবস্থাকে ইসলামী শরীয়াহ অনুমোদন করে না। এমতামত পেশকারী ইসলামী স্কলারগণ হলেন মোস্তফা জায়েদ, আবদুল্লাহ আল-কালকীলি, জালাল মোস্তফা আল সাইয়েদ। [১]

দুই ঃ কিছু ইসলামী গবেষক মনে করেন সাধারণ বীমা বা সম্পত্তি বীমা শরীয়ত সম্মত। তবে জুয়া, গারার এর সংশ্লিষ্টতার কারণে জীবন বীমা শরীয়ত সম্মত নয়। জীবন বীমা মিরাস ও অসিয়াহ নীতিমালা ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। এর উপর মরক্কোতে ৬ই মে ১৯৭২ সালে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আবদুর রহমান ইসা, আহমদ ইবরাহীম, মোহাম্মদ মুসা, মুফতি মুহাম্মদ বাখীত, মোহাম্মদ আবু জাহরা, শায়খ আল-আম্ভার, শায়খ জাদ আল-হক, আলী জাদ আল হক প্রমুখ ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ মতামত দিয়েছেন। [২]

এ বিষয়ের উপর ১৯৬৫ সালে কায়রোতে একটি মুসলিম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। [৩]

তিন ঃ বীমা ব্যবস্থাকে ইসলামী শরীয়াহ এর নীতিমালায় পরিচালনা করা সম্ভব। ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় সুদ, জুয়া, ও গারার এ জাতীয় কোন উপাদান থাকবে না। সম্পূর্ণ ইসলামী নীতিমালা ভিত্তিক ব্যবসায়ী পদ্ধতিতে বীমা পরিচালনা করা যায় এবং তা শরীয়ত সম্মত। শায়খ মোহাম্মদ আবদুহু, শায়খ ইবনে আবেদীন, মোহাম্মদ তকী আমেনী, শায়খ মাহমুদ আহমদ, মোস্তফা আহমদ জারকা, সাইয়েদ মুহাম্মদ সাদিক আল রুহানী, ইব্রাহীম তাহাবী, আহমদ তাহা আসসুনাসী, ইউসুফ, মুসা, মোহাম্মদ আলবাহী, আলী আল খাফিফ, জাফর শাহীদী, মোহাম্মদ নেজাতুল্লাহ ছিদ্দিকী, মোহাম্মদ মোছলেহ উদ্দিন, এম. এ. মান্নান, আলী জামালুদ্দিন আওয়াদ, আয়াতুল্লাহ খোমেনী প্রমুখ আলিম ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ বীমা ব্যবস্থাকে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালনা করা জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন। [৪]

---

১ Muslim Economic thenting. M.N. Siddique. Page- 216

২ Al- IQTISADUL Intisadul Islami July 1995, Page-60

৩ The thesis Insurance with a comparative analysis beteween common law and Islamic legal thought. Dr. Masum Billah. 1997, page- 92

৪ S. H. Islamic law in the conteporary world, Glasgow, 1985, Page-79, Tawjehul Masail. Ayatullah Khomini. 1979.

Dhaka University Institutional Repository

সুদ সম্পর্কে ইসলামী বিধান

ইংরেজীতে Interest, Usury,(الربوا) সুদ বাংলা, আরবীতে রিবা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুদ(الربوا)access বলা হয়। সুদকে ইসলামী অর্থনীতিতে অবৈধ। আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে হালাল করে সুদকে হারাম করেছেন।

احل الله البيع وحرم الربوا [৫]

অর্থাৎ, আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين فان لـم تفعلـوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان كنتم تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. [৬]

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের বাকী অংশ প্রত্যাহার কর। যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক। তোমরা যদি তা প্রত্যাহার না কর তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা রয়েছে। এখানে যদি তোমরা তাওবা কর (সুদ প্রত্যাহারের মাধ্যমে) তাহলে তোমাদের মূল ধন ফেরত পাওয়ার অধিকার থাকবে। তোমরাও জুলুম করবে না তোমাদের উপরও জুলুম করা হবে না।

واما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتـم مـن زكـوة تريدون وجه الله فاولئكهم المضعفون [৭]

অর্থাৎ, তোমরা যে বাড়তি সম্পদ দিয়ে থাক এ উদ্দেশ্যে যে, তাতে লোকদের সামষ্টিক সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। মূলত: আল্লাহর বিচারে তাতে কোন সম্পদ বৃদ্ধি পায় না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে যাকাত দিয়ে থাক, মূলত: তারাই সম্পদ বৃদ্ধি কারী হয়ে থাকে।

আয়াতটি সূরা আর-রুমের অংশ। সুরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। তখনকার সময় আরবসহ সারা বিশ্বের ব্যবসার প্রধান উৎস ছিল সুদ। লোকজন নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ গ্রহন করত। নির্দিষ্ট সময় ঋণ শোধ করা সম্ভব না হলে পরিশোধ্য ঋণের সাথে বাড়তি সুদ যোগ করে সময় বাড়িয়ে দিত। [৮]

---

[৫] আল কুরআন সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২৭৫

[৬] আল কুরআন সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২৭৮-৭৯

[৭] আল কুরআন সূরা আর-রূম, আয়াত নং ৩৯

[৮] তাফসীরে মারেফুল কুরআন আর রাহিকুল মাখতুম, বাংলা সংস্করণ পৃ:- ২০৬

Dhaka University Institutional Repository

যা মূলত: ছিল একটি শোষণ। কারণ ঋণ পরিশোধের সময় বাড়িয়ে দেয়া হলেও বাড়তি পরিমাণটা কোন বিনিময় ছাড়াই ঋণ গ্রহিতা দিতে বাধ্য হত। সে ঠেকায় পড়েই ঋণ গ্রহণ করেছিল। আর ঠেকার কারণেই নির্দিষ্ট সময় ঋণ পরিশোধ করতে পারে নাই। অথচ এ ঠেকাগ্রস্ত লোকটিকে শুধু সময় বাড়িয়ে দেয়ার বিনিময়ে পরিশোধিত পরিমাণের তুলনায় বেশি দিতে বাধ্য করা হয়েছে। এটা যেমন নির্মমতা, পারস্পরিক সহানুভূতিহীন আচরণ তেমন কোনরূপ বস্তুগত বিনিময় ছাড়াই অতিরিক্ত দিতে বাধ্য করা। আর এটাই শোষণ।

يمحق الله الربوا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم [৭/٩]

অর্থাৎ, আল্লাহ সুদকে নির্মূল করেছেন এবং যাকাত বা দান সমূহকে প্রবৃদ্ধি দান করেছেন এবং আল্লাহ তার বিধান অমান্যকারী কোন পাপীকেই ভাল বাসেন না। কুরআন কারিমে সুদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসুল (স) জাহেলী যুগের সুদ প্রথার মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের সঙ্গে যে বিরাট ব্যবধান তৈরি হয়েছিল কুরআন কারীমে বিধানের আলোকে তা বন্ধ করার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে বিশ্ববাসির নিকট সুদ বিহীন অর্থনীতির সঠিক আদর্শ পেশ করেন-

عن عبادة بن الصامت قال رسول الله (ص) الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهاب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثلا يدا بيد والفضل الربوا — [১৫/١٠]

অর্থাৎ, হযরত ওবায়দা ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত, রাসুল (স) বলেন, গমের পরিবর্তে গম, যবের পরিবর্তে যব, খেজুরের পরিবর্তে খেজুর, লবণের পরিবর্তে লবণ, স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য বিক্রি করতে হলে সমান সমান হতে হবে ও নগদ হতে হবে। অতিরিক্ত যা হবে তাই সুদ।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাসুল (স) হতে বর্ণনা করেছেন-

لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فاني اخاف عليكم الربوا. [১১/١١]

অর্থাৎ, তোমরা এক দিরহামকে দুদিরহামের বিনিময়ে বিক্রি কর না, কারণ আমার ভয় হয় এর ফলে তোমরা সুদী কারবারে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

---

[৯] আল কুরআন সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২৮৬

[১০] মুসলিম শরীফ, বাবুর রেবা।

[১১] মুসলিম শরীফ, বাবুর রেবা।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স) অভিসম্পাত করেছেন সুদখোরকে সুদদাতাকে, সুদের হিসাব রক্ষক এবং তার সাক্ষীকে এবং তিনি বলেছেন এরা সকলেই সমান অপরাধী।

عن علي (رض) قال قال رسول الله (ص) اذا اراد الله بقوم هلاكا فشي فيهم الربا.[১২] ১২/১

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন তখন তাদের মধ্যে সুদী লেনদেন ব্যাপক আকার ধারন করে।

عن عبد الله بن هنظلة (رض) قال قال رسول الله (ص) درهم ربا ياكله الرجل وهو يعلم اشد من ستة وثلاثين زينة.[১৩] ১৩/

অর্থাৎ, হযরত আবদুল্লাহ বিন হানযালা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন জেনে শুনে সুদের এক দিরহাম গ্রহণ করা ছত্রিশবার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা মারাত্মক অপরাধ।

عن ابي هريرة (رض) قال قال رسول الله (ص) رايت ليلة اسري بي لما انتهينا الي السماء السابعة فنظرت فوقي فاذا انا برعدو بروق وصواعق قال فاتيت علي قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تري من خارج بطونهم قلت يا جبرئيل من هؤلاء قال هؤلاء أكلة الربا.[১৪] ১৪/

অর্থাৎ, হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে খোদা (স) বলেছেন- মিরাজের রাতে আমি সপ্তম আকাশে পৌছে যখন উপরের দিকে তাকালাম তখন বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ ও গর্জন দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট এলাম যাদের একটি ঘরের ন্যায় বিস্তৃত। তাদের পেট ছিল সর্পে ভরপুর। সর্পগুলো বাহির থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে জিবরাঈল! তারা কারা? তিনি বললেন (জিবরাইল) তারা সুদখোর সম্প্রদায়।

عن جابر بن عبد الله (رض) قال لعن رسول الله (ص) اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء[১৫] ১৫/

---

[১২] কানযুল উম্মাল

[১৩] (মিশকাত শরীফ আরবী সংস্করণ, পৃ-, ২৪৬

[১৪] মুসনাদে আহমদ, (মিশকাত শরীফ আরবী সংস্করণ), পৃ- ২৪৬

[১৫] মুত্তাফাকুন আলাইহ (মিশকাত শরীফ) বাবুর রিবা পৃ- ২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন রাসূল (স) সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক এবং সুদের লেনদেন সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন তারা সকলেই সমান অপরাধী।

রাসূল (স) সুদ সম্পর্কে বলেছেন, সুদের সত্তরটি স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্নটি হল কোন ব্যক্তি তার নিজের মাকে বিবাহ করার মত অপরাধ।[১৬]

সুদের শ্রেণী বিভাগ ঃ রিবা বা সুদ দুপ্রকার ১। রিবা নাসিয়া ২। রিবা ফদল।

১। রিবা নাসিয়া বা মেয়াদী সুদ ঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট থেকে কোন কিছু নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ফেরত দেয়ার শর্তে গ্রহণ করার পর মেয়াদ শেষে চুক্তি অনুযায়ী যে অতিরিক্ত পরিমাণ পরিশোধ করে তাকে রিবা নাসিয়া বলে।

২। রিবা ফদল বা মালের অতিরিক্ত সুদ ঃ একজাতীয় দ্রব্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত যে অংশ নেয়া হয় তাকে রিবা ফদল বলে।

সুদভিত্তিক লেনদেন সব সময়ই বাণিজ্যিক পক্ষপাতিত্বের সৃষ্টি করে। সুদ ব্যবস্থা শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাকই নিষিদ্ধ করেননি অন্যান্য ধর্মেও তা নিষিদ্ধ। খৃস্টান ধর্মের শুরু থেকে সংস্কার আন্দোলনের অভ্যুত্থান এবং রোমে পোপের আওতাধীন চার্চ হতে অন্যান্য চার্চের বিভক্তিকাল পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল। খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্টে সুদ নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ আছে।

হযরত মুসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত তাওরাত কিতাব বর্তমান বিশ্বের কোথায়ও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না। বর্তমান ইহুদিরা যে দুটি কিতাবকে ধর্মীয় গ্রন্থ বলে দাবী করে তাতেও সুদকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। Deuteronomy এর ২৩তম স্তবকে বলা হয়েছে- তোমরা তোমাদের ভাইকে সুদে ঋণ দিবে না। অর্থের উপর দ্রব্য সামগ্রীর উপর বা অন্যান্য যে কোন জিনিষের পর সুদে ঋণ দিবে না।

Exodus এর ২২তম স্তবকে বলা হয়েছে- তোমরা যদি আমার কোন লোককে অর্থ ঋণ দাও, যারা তোমাদের অপেক্ষা গরীব তাহলে তোমরা মহাজন হবে না এবং তোমরা তার নিকট থেকে সুদ আদায় করবে না।

---

[১৬] মেশকাত শরীফ আরবী সংস্করণ, পৃ- ২৪৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতি বিশারদ অমুসলিম লর্ড কিসন বলেছেন, অর্থ বন্টনের অসমতা এবং পরিপূর্ণ বিনিয়োগের পথে বাধার কারণ হচ্ছে সুদ প্রথা। কেননা এর দরুন মুলধন সংগ্রহ ও বিনিয়োগ সীমিত হয়ে পড়ে। [১৭]

এরিস্টেটল সুদ গ্রহণ প্রত্যাখান করেছেন। ক্যাটো এ ধরনের ব্যবস্থা প্রত্যাখান করে সুদ গ্রহণকে বেআইনী ঘোষণা করেছেন। ক্যাটো এ ধরনের ব্যবস্থা প্রত্যাখান করে সুদ গ্রহণকে বেআইনী ঘোষণা করেছেন। ক্যাটো এ ধরণের ব্যবস্থা প্রত্যাখান করে সুদ গ্রহণকে নরহত্যার সাথে তুলনা করেছেন। খৃষ্টপূর্ব ৩৪০ সালে ল্যাকস জেনুসিয়া রোমে সুদকে অবৈধ ঘোষণা করেছেন।[১৮] ইহুদী ধর্মানুসারে সুদকে অন্যায় ও অবন্ধুসুলভ কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হত। ১৩১১ সালে পোপ ক্লেমেন্ট ঘোষণা করেন- সুদের সাথে সম্পৃক্ত সকল লেনদেন নিষিদ্ধ এবং এরপর তিনি ঘোষণা করেন এ ধরনের ব্যবস্থার অনুকূলে বিদ্যমান সকল ধর্মনিরপেক্ষ আইন ও বাতিল করা হয়েছে।[১৯] মানবতা বিবর্জিত হবার কারণে আল্লাহ তায়ালা সুদকে হারাম করেছেন। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضعفة واتقو الله لعلكم تفلحون.[২০]

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

সুদ সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে। সাম্য ও মৈত্রীর সমাজকে বাধাগ্রস্ত করে। অপরাধ প্রবণতাকে বৃদ্ধি করে। ধনী ও দরিদ্রের মাঝে অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতিই হচ্ছে মানুষের মাঝে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূর করার একমাত্র মাধ্যম। তাই প্রত্যেকটি স্তরে সুদ মুক্ত অর্থ ব্যবস্থার সঠিক বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন। সুদী অবকাঠামো পরিবর্তন করে সুদ মুক্ত অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আর এ কাজকে

---

[১৭] ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং রূপরেখা, মাও: মো: ফজলুর রহমান আশ্রাফী। পৃ- ১১৪।

[১৮] The financial Instrument Used by Islamic Bank, Imtias Ahamad pervez. New Horizon 1995, Page-3

[১৯] The financial Instrument Used by Islamic Bank, Imtias Ahamad pervez. New Horizon 1995, Page-3

[২০] আল কুরআন সূরা আল ইমরান, আয়াত- ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

সহজতর করার একমাত্র উপায় হল খোদাভীতির মাপকাঠী সামনে রেখে সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে ইবাদত মনে করা।।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় মুদারাবাহ অর্থ ব্যবস্থার পদ্ধতি নৈতিকতা সম্পন্ন ও স্বচ্ছ। অর্থনৈতিক লেনদেনে মুদারাবাহ পদ্ধতি ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে। বর্তমান পৃথিবীতে সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী অর্থনীতিই ব্যবসায়িক লেনদেনে অধিকতর গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করে চলছে। [২১]

---

[২১] বীমায়ে জিন্দেগী, মুফতি মুহাম্মদ শফী, পৃঃ- ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

সুদ ও বীমা

বীমাগ্রাহকদের প্রিমিয়ামের অর্থ বীমা কোম্পানীর নিকট বিপুল পরিমাণে জমা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে বীমাগ্রাহকদের ক্ষতিপূরণের চেয়েও অনেক বেশি অর্থ বীমা কোম্পানীর হাতে এসে জমা হয়। বীমাগ্রাহকদের নতুন নতুন পলিসি করতে থাকায় প্রতি মাসে / তিন মাসে ছয় মাসে বা বছরে প্রিমিয়ামের টাকা নিয়মিত আসতে থাকে। প্রিমিয়ামের পরিমাণটাও ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণের তুলনায় বেশি রাখা হয়।

বীমা কোম্পানীদের এ বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যবহারের খাতের উপর নির্ভর করবে সুদ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়।

সাধারণ বীমা কোম্পানীগুলো এটাকে বেকার ফেলে রাখে না। সাধারণত সরকারী সিকিউরিটি বণ্ডক্রয় করাতেই এ টাকা বেশীর ভাগ বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু তাতে উচ্চহারে সুদ হয় বলে জমা পড়া টাকা সাধারণত সুদী কারবারে বিনিয়োগ হয়ে থাকে। বীমা গ্রাহকদের মধ্যে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তাকে যে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় তাতে সুদ বাবদ পাওয়া অংশটাই অধিক হয়ে থাকে। যার ফলে বীমা কোম্পানী ও বীমাগ্রহীতা চরম সুদী কারবারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে।[২২] অথচ ইসলামে সুদ হারাম করা হয়েছে। তা সাধারণ হারেই হোক বা চক্রবতী হারেই হোক। এ কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে বীমা নিয়ে অনিহাও সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে।

সুদভিত্তিক যে কোন লেনদেন ইসলাম হারাম করেছে। সাধারণ বীমা কোম্পানীগুলো যুক্তি হল প্রিমিয়াম বাবদ জমা পড়া টাকা কোন লাভজনক বা প্রবৃদ্ধিজনক কাজে বিনিয়োগ না করলে ক্ষতিপূরণ দানের টাকার মাত্রা যথেষ্ট পরিমাণে হবে না। আর তা যথেষ্ট পরিমাণে করতে চাইলে প্রিমিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। ফলে অনেকের পক্ষেই তাতে অংশগ্রহণ করা ও তার কল্যাণ লাভ অসম্ভব হয়ে দাড়াবে।

অন্যদিকে এ বিপুল পরিমাণ টাকা কোন প্রবৃদ্ধিমূলক কাজে বিনিয়োগ না করে বেকার ফেলে রাখা জাতীয় সম্পদের বিরাট অপচয় ছাড়া কিছু হতে পারে না। সুতরাং এ সম্পদকে প্রবৃদ্ধিমূলক কাজেই বিনিয়োগ করতে হবে।

---

[২২] ইসলামে অর্থনৈতিক নিরপত্তা ও বীমা, মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিম, পৃ- ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ বীমা কোম্পানী গুলো যে যুক্তি দেখিয়ে থাকে তা মূলত ঠিক নয়। কারণ প্রিমিয়াম বাবদ জমা পড়া এ বিপুল টাকা হালাল পদ্ধতিতে জাতীয় কল্যাণমূলক ও প্রবৃদ্ধির কাজে বিনিয়োগ করা যায়। কিন্তু মূল ধন বিনষ্ট হবার আশংকাযুক্ত কোন কাজে হয় তা বিনিয়োগ করা যাবে না একথা সর্তসিদ্ধ। তবে বেসরকারী বীমা কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে এ সমস্যা যতটা প্রকট সরকারী বীমা সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে ততটা নয়। কারণ সরকার নিজ দায়িত্বে জমাকৃত অর্থকে এমন সব কাজে অনায়াসেই বিনিয়োগ করতে পারে যেখানে মূলধন সংরক্ষিত থাকে এবং মুনাফা ও বিপুল পরিমানে আসে।

সরকারী বীমার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সুযোগ বেশী থাকলেও বেসরকারী মালিকানাধীন বীমার ক্ষেত্রেও তেমন কোন অসুবিধা নেই। সুদভিত্তিক অর্থনীতি থেকে মুক্তির লক্ষে একনিষ্ঠ ভাবে যদি শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, ঔষধ কারখানা প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করে অথবা অন্য কোন প্রবৃদ্ধিমূলক ব্যবসায়েও বিনিয়োগ করে তা হলে প্রচুর পরিমাণে মুনাফা করা সম্ভব।

অনেকে মনে করেন বীমাগ্রাহক নির্দিষ্ট কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে বীমা সংস্থার নিকট থেকে এত বেশি পরিমাণ টাকা পেয়ে যায় যা তার প্রিমিয়াম বাবদ টাকার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। কাজেই তাতো সুদ হবেই।

আমরা মনে করি বৃদ্ধি মানেই সুদ নয়। বীমা কোম্পানী গ্রাহকদের প্রিমিয়ামের টাকা যদি হালালভাবে বিনিয়োগ করেন তা হলে তার অর্জিত ব্যবসার মুনাফা থেকে ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ দেয়াতে তো কোন দোষ নেই। অন্যদিকে ইসলামী বীমা ব্যবস্থার মধ্যে প্রিমিয়াম বা কিস্তির টাকা দুটি একাউন্টে জমা হয়ে থাকে। বড় অংশের টাকা যে একাউন্টে জমা হয়ে থাকে তাকে পার্টিসিপেন্ট একাউন্ট বা মূল প্রিমিয়াম একাউন্ট বলে। এ পার্টিসিপেন্ট একাউন্টে প্রিমিয়ামের প্রধান অংশটি জমা হয়ে থাকে। এ অংশ হতে বীমা কোম্পানীর খরচ এবং অন্যান্য দায় বা পাওনা মিটানো হয়। আর পার্টিসিপেন্ট একাউন্টের টাকা বিনিয়োগের মাধ্যমে যে মুনাফা অর্জিত হয় তা পার্টিসিপেন্ট একাউন্ট জমা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পার্টিসিপেন্ট একাউন্ট ভিন্ন পলিসি হোল্ডারের প্রিমিয়ামের টাকা থেকে একটি ক্ষুদ্র অংশ কোম্পানীর সাথে চুক্তি অনুযায়ী তাবাররুউন একাউন্টে জমা হয়ে থাকে। তাবাররুউন একাউন্টের জমা টাকা দিয়ে রিস্ক (Risk) কাভার করা হয়। [২৩]

তাবাররুউন একাউন্টে যে টাকা জমা হয় তা দান হিসেবে গণ্য হয়। এ টাকা থেকে পলিসি হোল্ডারগণ কিছুই পাবে না। যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে।

যাদের ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনা ঘটে তারাই এ তাবাররুউন ফান্ড থেকে সাহায্য পাবে। এ সাহায্য সকল পলিসি হোল্ডার কর্তৃক স্বীকৃত ও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত।

তাবাররুউন আরবী শব্দ। আরবী অভিধানে উল্লেখ আছে তাবাররুউন শব্দের অর্থ মুক্ত হওয়া, খালাস পাওয়া। কোন পলিসি হোল্ডার ক্ষতির সম্মুখিন হলে অন্যান্য পলিসি হোল্ডারদের দায়িত্ব ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। এ ফান্ডের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে সকলেই স্বীয় দায়িত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে বলে এ ফান্ডকে তাবাররুউন ফান্ড বলে।

বীমা কোম্পানী সুদী খাতে বিনিয়োগ না করে হালাল ব্যবসায় বিনিয়োগ করে যে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে তা নি:সন্দেহে সুদ নয়। অতএব বিপদে পড়লে ক্ষতিপূরণ বাবদ বীমাকারী যে পরিমাণ টাকা একসাথে পায় তা তার দেয়া প্রিমিয়াম বাবদ টাকার অনেক বেশী হলেও তাকে কোন দিক দিয়ে সুদ বলা চলে না। ক্ষতিপূরণ বাবদ একসাথে যে টাকা দেয়া হয় তা সুদ হিসেবে দেয়া হয় না এবং প্রিমিয়াম বাবদ কতটাকা জমা দেয়া হয়েছে তারও হিসেব করে দেয়া হয় না।[২৪] ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারিত হয় চুক্তিভিত্তির উপর। জীবন বীমার ক্ষেত্রে দেয় টাকার পরিমাণ পূর্ব নির্ধারিত থাকে। কিন্তু সম্পত্তি বীমার ক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় টাকার পরিমাণ পূর্বনির্ধারিত থাকে না। বিভিন্ন বীমা গ্রাহকের ক্ষতির পরিমাণ এক হতে পারে না। সম্পত্তির ক্ষেত্রে সমুদ্র জাহাজ থেকে শুরু করে যে সব বস্তুর মূল্য পূর্ব থেকেই জানা থাকে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় টাকার পরিমাণ ও পূর্ব নির্ধারিত থাকে, কিন্তু তাকেও সুদ বলা যাবে না।[২৫]

---

২৩ The thesis Insurance will a comparative analysis between common law and Islamic legal thought. Dr. Masum Billah. 1997.

২৪ ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, মাও: মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পৃ- ১১৯

২৫ ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, মাও: মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পৃ- ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

জীবন বীমার ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ কতটা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হল নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। বিধায় একটি সীমার মধ্যে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারিত থাকে।

বীমা একটি Mutual সংস্থা, তাতে প্রিমিয়াম বাবদ জমা পড়া টাকা বীমা গ্রাহক ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে ফেরত দেয়া হয়। প্রিমিয়াম হিসেব করা হয় বিপুল সংখ্যক বিধি ও গড় বিধির ভিত্তিতে। যেন ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তিই ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত না হয়। তাই বলা যায় বীমা ও সুদী কারবারের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান হয়ে থাকে। বীমাকারী ব্যক্তিগণ যে টাকা মিলিতভাবে প্রিমিয়াম বাবদ জমা দেয় তারা ক্ষতিপূরণ বাবদ সে টাকাই পেয়ে থাকে যদিও ব্যক্তির পার্থক্য হয়ে থাকে। কিন্তু সুদী কারবারে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকে না। তাই সুদও বীমা এক নয়।

<u>পারস্পরিক কল্যাণের ক্ষেত্রে ইসলামের দাবী ও বীমা</u> ঃ পবিত্র কোরআন শরীফের আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন-

وتعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا على الاثم و العدوان.[২৬]

অর্থাৎ, সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অপরকে সাহায্য কর। পাপও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সাহায্য করো না।

সমাজবদ্ধ মানুষ সকলে পরস্পরের সাহায্যকারী হবে এটিই ইসলামের দাবী। কোন মানুষ আকস্মিকভাবে দুর্ঘটনা জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, এসময় তার ক্ষতির প্রতিবিধান করা না হলে তার গোটা পরিবার বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এমন সময় তা ক্ষতিপূরণের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা করা শুধু মানবিক দায়িত্বই নয় বরং ইসলামের সমাজ অবকাঠামোর একটি বিধান। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাধ্য অনুযায়ী সাহায্য সহযোগিতা করা ব্যক্তিগতভাবেও প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। বর্তমানকালের মানুষ নিজেকে নিয়ে এতই ব্যস্ত যে, এ সাহায্য দানের কথা নীতি হিসেবে যতই বলা হোক না কেন এবং যতই স্বীকার করে নেয় না কেন, কার্যত সে সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। আবার এ ধরনের বিপদ এতদ্রুত সংঘটিত হয় এবং ক্ষতির পরিমাণ এতবেশি হয় যে, তাৎক্ষণিকভাবে অনেকের ইচ্ছা ও আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষতির

---

[২৬] আল কুরআন, সূরা মায়েদাহ আয়াত-২

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবিধান করা সম্ভব হয় না। এ কারণেই ইসলাম এ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছে ইসলামী রাষ্ট্রকে, রাষ্ট্রের এ বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজে সরকারকে তা করা বা সরকারী কাজ বেসরকারীভাবে সম্পন্ন করার মানসিকতা নিয়ে বীমা সংস্থা গড়ে তুলা শুধু ভালই নয় একান্ত বাঞ্ছনীয় ও কর্তব্য।[২৭] এরূপ সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা রাসূল (স) পরিচালিত রাষ্ট্রের ও রাষ্ট্রনীতি ছিল। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ আলোচ্য ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। রক্তমূল্য পরিশোধের দায়িত্ব স্বয়ং ইসলামী সরকার নিজেও পালন করতে পারত। কিন্তু তা না করে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নিকটাত্মীয়দের উপর তার সম্পূর্ণ বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বিধানটি কুরআনে শরীফে উল্লেখ আছে-

ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الي اهله.[২৮]

অর্থাৎ, কেউ কোন মুমিন ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা করে তাহলে দণ্ড স্বরূপ তাকে একজন মুমিন ক্রীতদাস মুক্ত করতে হবে এবং নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নিকট দিয়াত বা রক্তমূল্য পৌঁছাতে হবে।

ভুলক্রমে কারো দ্বারা কোন মুসলমান ব্যক্তি নিহত হলে শাস্তি স্বরূপ দুটি কাজ করতে হবে। একটি হচ্ছে একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করা। এ দায়িত্ব হত্যাকারী নিজের উপর। দ্বিতীয়টি হচ্ছে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের নিকট দিয়াত বা রক্তমূল্য পৌঁছিয়ে দেয়া। এ দিয়াত আদায় করার দায়িত্ব ইসলামী আইন অনুযায়ী আকিলার উপর। আকিলা ইসলামী আইনে একটি গৃহীত পরিভাষা। হত্যাকারীর নিকটবর্তী আত্মীয় পুরুষদেরকে আকিলা বলা হয়।

এখানে প্রশ্ন উঠা উচিত হবে না যে, হত্যাকারীর অপরাধের বোঝা কেন তার স্বজনদের উপর চাপানো হয়। তারা তো নিরাপরাধ। এর কারণ হল যে, হত্যাকারীর স্বজনরাও দোষী। তারা তাকে এ ধরনের উশৃঙ্খল কাজ থেকে বাধা দেয়নি। রক্তপণ দেয়ার বিনিময়ের ভয়ে ভবিষ্যতে তারা তার দেখাশোনা করতে ত্রুটি করবে না।[২৯]

---

২৭ ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহিম, পৃ- ১২১

২৮ আল কুরআন, সূরা আন-নিসা, আয়াত- ৯২

২৯ তাফসীরে মারেফুল কুরআন, (বাংলা সংস্করণ) পৃ- ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

কাফফারা অর্থাৎ ক্রীতদাস মুক্ত করা কিংবা রোযা রাখা স্বয়ং হত্যাকারীর করণীয় এবং রক্ত মূল্য পরিশোধ বিনিময়ে হত্যাকারীর স্বজনদের উপর ওয়াজিব। শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে আকিলা বলা হয়। [৩০]

ইমাম আবু হানীফা (র) এ পর্যায়ে সাহায্য কর্মের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (র) এর মতে আকিলা বলতে গোষ্ঠীভূক্ত লোকদেরকে বুঝায় যারা পারস্পরিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠা ও উপহার আদান-প্রদানের লক্ষ্যে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এ কারণে তা আদায় করা গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। [৩১]

ড. মুহাম্মদ মহসিন খান বলেন আকিলা অর্থ আসাবা যারা হত্যাকারীর সাথে সম্পর্কিত। [৩২]

এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মানুষকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষার মানসিকতা নিয়ে গোষ্ঠিবদ্ধভাবে বীমা সংস্থা গড়ে তোলা অতি মহৎকাজ হিসেবে পরিগণিত করতে হবে। বিশেষ করে শরীয়তের নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে এ সংস্থাকে মুক্ত করাও মুসলমানদের একান্তকর্তব্য। ইসলাম সমাজের লোকদের জন্য যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়েছে তা এমন জনকল্যাণমূলক সংস্থাগুলোর মাধ্যমেই সম্পন্ন করা সম্ভব।

---

৩০ তাফসীরে মারেফুল কুরআন, (বাংলা সংস্করণ) পৃ- ২৭৫

৩১ ইসলামী অর্থনৈতিক নিরপত্তা ও বীমা, মাও: আবদুর রহিম, পৃ- ৯৫

৩২ The thesis Insurance with a comparaticve and alasis between common law and Islamic legal thought 1997. P- 15.

Dhaka University Institutional Repository

জুয়ার শরয়ী বিধান

জুয়া খেলা বা বাজি ধরা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম, মদ পান ও মূর্তিপূজা যেভাবে মানবতা বিবর্জিত ও ইসলামে নিষিদ্ধ তদ্রূপ জুয়া বা বাজি ও ইসলামে নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন-

يايها الذين امنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشـــــيطان فاختنبو ه لعلكم تفلحون.٩٠/٣٣

অর্থাৎ, হে ইমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী, ভাগ্যজানার জন্য ব্যবহৃত তীর অপবিত্র, শয়তানী কাজের অংশ। অতএব তোমরা একাজ সম্পূর্ণরূপে পরিহার কর। তবে তোমরা সফলতা লাভ করবে।

জুয়া ও বীমা ঃ কেউ কেউ বীমাকে জুয়ার সাথে তুলনা করেন। কারণ জুয়ায় সামান্য টাকা দিয়ে একসাথে বিপুল পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়। বীমা ও তদ্রূপ যেমন কোন বীমাকারী ২/৪টি প্রিমিয়াম দেয়ার পর তার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে বীমা কোম্পানীর পক্ষ হতে অনেক টাকা পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তি মরে গেলে তার উত্তরাধিকারীরা একত্রে অনেক টাকা পেয়ে থাকে।

কারো দোকান পাট, কল-কারখানা, ঘর-বাড়ী আগুনে পুড়ে গেলে বা কোন সামুদ্রিক জাহাজ ডুবে গেলে বা কোন বিমান বিধ্বস্ত হলে জাতীয় বা আন্তর্জাতিক বীমা কোম্পানী থেকে অনেক টাকা পেয়ে থাকে। অনেকেই এগুলোকে সুদ মনে করে জনগণকে বীমা পলিসি গ্রহণে নিরুৎসাহিত করে।

জুয়া হারাম এতে কারো মতভেদ নেই, কুরআন শরীফের আয়াতের মাধ্যমেই তা হারাম ঘোষিত হয়েছে। কুরআন শরীফে জুয়াকে الميسر (মাইসার) বলে উল্লেখ করেছে। الميســر শব্দটি يسر (ইয়াসার) থেকে গঠিত, যার অর্থ সহজ, সাবলীল পরিশ্রম মুক্ত হওয়া।[৩৪] সুতরাং বাজি বা জুয়া সবই হারাম। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় যে, জুয়া খেলার সাথে বীমা শিল্পের তথা একজনের অর্থনৈতিক ঝুঁকি বহুলোকে মিলিত হয়ে গ্রহণ ও তার মুকাবিলায় সহযোগিতার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসা এক বিন্দু পরিমাণ সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য আছে কি? জুয়া খেলায় বাজি ধরতে হয়। কিন্তু বীমাতে বাজি ধরার কোন বিষয় নেই।

---

৩৩ সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত- ৫৪২

৩৪ আল মুনজিদ, পৃ:- ৯২৪

Dhaka University Institutional Repository

একথা সর্বজন বিদিত যে, পাশ্চাত্যের নাস্তিকতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও হালাল-হারাম পার্থক্যহীন বীমাই আজকে সমাজে বিকশিত। তাদের নিকট জুয়া হারাম নয়। তাদের পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সর্বত্রই প্রতিফলিত হয়। তাই তাদের বীমা ব্যবস্থায় জুয়ার শামিল হওয়াই স্বাভাবিক বিষয়। বীমা পাশ্চাত্য সমাজে পুঁজিপতিদের ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে পরিচালিত হয়েছে। ফলে সুদ ও সুদী ব্যবস্থাপনা ও বীমা অবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই এরূপ বীমা ইসলাম সম্মত নয় এবং এরূপ বীমা থেকে মুসলিম সমাজ বেঁচে থাকা একান্ত ঈমানী দায়িত্ব।[৩৫]

আমাদের প্রস্তাবিত বীমা হল ইসলাম সমর্থিত আলোচ্য ব্যবস্থা। এটি এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে মানুষ তার কোন দুর্ঘটনা বা বিপদকালে বড় রকমের আর্থিক ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য পেতে পারে। এখানে জুয়া বা সুদের আশ্রয় নেয়ার কোন সুযোগ নেই।

বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত বীমার উৎস হল লন্ডন নগরী। পাশ্চাত্য সুদী ব্যবস্থাপনায়ই এর জন্ম। এখন প্রশ্ন হল ইসলামী বিধানে প্রচলিত বীমার মোকাবেলায় নতুন কোন বীমা ব্যবস্থার সংস্করণ বা পাশ্চাত্য বীমার অবকাঠামো ঠিক রেখে জুয়া ও সুদী পদ্ধতি পরিহার করে ইসলামী বিধান মতে পুনর্গঠিত করে মানব কল্যাণ সাধন করা সম্ভব। কোন সংস্কার পূর্বে অবকাঠামো ইসলামী আদর্শের আলোকে পরিবর্তন করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আর যারা সর্বক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়ন চায় তাদের জন্য এরূপ ক্ষেত্রে সংশোধনী চালানো এটি একটি মহান দায়িত্বও বটে। কোন সমাজে জুয়াপূর্ণ বীমা বা বীমার নামে জুয়া খেলা চলতে থাকবে আর আমরা অদূরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকব যে, জুয়া চলবে না হে লোকজন তোমরা বীমার আশ্রয় নিবে না। তখন এটি হবে অলস মস্তিষ্ক বিশিষ্ট অকর্মণ্য লোকের প্রলাপ।

জুয়া খেলায় জুয়ারীকে বাজি ধরাতে হয়। যেমন- ঘোড়া দৌড়, ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা, দাবা খেলা বা লটারীর টিকেট ক্রয় করা, বাজি ধরাটা যে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে বাজি ধরবে না হয় ধরবে না। বাজি না ধরলে জুয়ার হার জিতের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। জুয়াতে যে হেরে যায় তার বিরাট আর্থিক ক্ষতি হয়। এ ঝুঁকি থেকে তাকে ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে আসে না এবং রক্ষা করার

---

[৩৫] ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পৃ- ১১০

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্ব ও কারো উপরে বর্তায় না। আর যদি জিতে যায় তা হলে সে বিরাট অংকের টাকা পেয়ে থাকে। এটাকার সাথে অন্য কারো কোন সম্পর্ক থাকে না। এর দ্বারা সমাজের কোন কল্যাণ তে সাধিত হয়ই না বরং সমাজের অর্থ কাঠামো গত ভিত ধ্বংস হয়ে যায়।

ইসলামী বীমা ব্যবস্থার সাথে জুয়ার কোন ধরণের সাদৃশ্য বা মিল নেই। জুয়া খেলায় লিপ্ত হলেই তাকে জয় পরাজয় যে কোন একটির সম্মুখিন হতেই হবে। কিন্তু বীমা পলিসির আশ্রয় নিলেই তাকে বিপদ বা অর্থনৈতিক ঝুঁকির সম্মুখিন হতে হবে এবং বিপুল পরিমাণে টাকা পাবে এমনটি হয় না। বীমা না করলে যেমন বিপদ আসতে পারে তেমন বীমা করলেও সে বিপদ আসতে পারে,আবার বীমা করছে সে কোন বিপদের সুম্মখিন নাও হতে পারে। তবে কৃত্রিম ভাবে যদি প্রচুর অর্থ পাবার জন্যে বিপদের সৃষ্টি করা হয় তবে তাকে ক্ষতি পুরণ দেয়া যাবে না।

বর্তমানে দেখা যায় মানুষ বীমা কোম্পানী থেকে অধিক পরিমাণ অর্থ লাভ করতে নিজেই সেচ্ছায় বিপদের সৃষ্টি করে তা হলে তাকে কোন রূপ ক্ষতিপুরণ দেয়া যাবে না যদি এ ভাবে ক্ষতিপুরণ দিতে হয় তা হলে কোন কোম্পানীর ব্যবসা করার সুযোগ থাকবে না।

জীবন সংগ্রামেই মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে জড়িয়ে পরে। তাই ব্যবসা - বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, সমুদ্র জাহাজ ও আমদানী -রপ্তানীতে বিপদ হওয়াই স্বাভাবিক; এ ধরণের আকস্মীক বিপদের ঝুঁকি মোকাবিলায় বীমা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। জন্মিলে মৃত্যুর সম্মুখিন হতে হবেই। এ মৃত্যু জীবনে কখন আসবে তা কেউ বলতে পারে না। কোন লোক মারা গেলে সে নাবালেগ সন্তান -সন্ততি, বৃদ্ধ পিতামাতা উপার্জন হীন ভাই-বোন রেখে গেল। ওয়ারিশদের ভরণ-পোষণের তেমন কোন ব্যবস্থা করে যেতে পারে নাই। তখন তাদের পরিনতি কি হবে ?. যদি বলা হয় আল্লাহই রিজিকদাতা। আল্লাহই তাদের ব্যবস্থা করবেন। আমি বলব আল্লাহ ব্যবস্থা করবেন কোন উসিলার মাধ্যমে । আল্লাহ নিজে এসে তো ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করবেন না। বীমা করার সাথে মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। ওয়ারিশদেরকে অসহায় রেখে যাবার চেয়ে সে যদি গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে কোন জীবন বীমার ব্যবস্থা করে যায়। যা তার অনাকাংখিত মৃত্যুতে তার অসহায় ওয়ারিশদের মৌলিক প্রয়োজন পুরণের ব্যবস্থা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

তা হলে তার কাজ কি জুয়া খেলার সাথে সামঞ্জস্যশীল হল। নিশ্চয়ই তা নয় রাসুল (সঃ) ও এ রকম কাজের উৎসাহ যোগাতে এরশাদ করেছেন[১] - عن عامر ابن سعد ابن ابى وقاص (رض) قال قال رسول الله ص ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تركهم عالة يتكففون الناس (البخارى)

অর্থাৎ হযরত আমের ইবনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল (সঃ) বলেছেন, তুমি তোমার উত্তরাধীকারীদেরকে নিঃস্ব করে অপরের মুখাপেক্ষী করে রাখার চেয়ে পরমুখা পেক্ষীহীন করে রেখে যাওয়া অতীব উত্তম।

মৃত ব্যক্তি উত্তরাধীকারীদের জন্যে ধন সম্পদ রেখে যেতে পারেনি । কিন্তু রেখে গেছে গোষ্টিবদ্ধ বীমা বা আকিলা ব্যবস্থা যা তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হবে। এরূপ ব্যবস্থা করা তার জন্যে শুধু যায়েজই নয় বরং অতি কল্যাণ কর একটি কাজ সে করেছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

অন্য দৃষ্টি কোন থেকে যদি বলা হয় বীমার প্রিমিয়ামের টাকা ও জুয়া খেলার টিকেট ক্রয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। জুয়ারী জুয়ার টিকেট ক্রয় করার পর জয়ী না হলে কিছুই পায় না। তেমনি ভাবে বীমা গ্রহীতা প্রিমিয়াম দিয়ে ঝুকির সম্মুখিন না হলে কোন কিছুই পাবে না। জুয়ারী বাজি না ধরলে বাজি ধরা জনিত আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হত না। অপর দিকে বীমা কারী বীমা না করলে তাকে প্রিমিয়াম দিয়ে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হত না। তাই এ দু'টি অবস্থা একই।

আমার মতে জুয়া ও বীমার একই অবস্থা হতে পারেনা সম্পূর্ণ ভিন্নতর জুয়া কারো জন্যেই অপরিহার্য নয়। তার উপর সমাজ সভ্যতার উন্নতি নির্ভরশীল নয়। জুয়া সমাজের অবনতি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে জাতীকে নিয়ে যায় কর্ম বিমুখতা ও অলসতার অতল গহ্বরে। তাতে জয়লাভ করতে কোন পরিশ্রম বা কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। হয় না কোন চেষ্টা, সাধনার; জুয়ারীরা অর্থপার্জনের ক্ষেত্রে কখনো কোন কষ্ট পরিশ্রম করতে আগ্রহী হয় না। ফলে গোটা সামাজই অকর্মণ্য ও কর্মবিমুখ মানুষে ভরে যাবে। উৎপাদন হবে না। তাই সমাজের উন্নতি অগ্রগতি চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। সভ্যতার পতন ঘটবে। অন্য দিকে প্রিমিয়াম দিয়ে মানুষ সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পায়। কোন ভয় নেই এগিয়ে যাও, যেই

---

[১] সহীহ আল বুখারী, কিতাবুদ দিয়াত, মিশকাত শরীফ, আরবী সংস্করণ, বাবুল ওয়াসায়া, পৃ. ২৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

বিপদে পড়বে তার জন্যেই রয়েছে সহায়তা। আর প্রিমিয়ামের টাকা সংগ্রহ করতে ও মানুষকে হতে হয় একজন একনিষ্ট কর্মী । পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করে প্রিমিয়াম দিতে হবে। তাও শুধু একবার দিলে চলবে না। চুক্তি মত তা চালিয়ে যেতেই হবে। কর্ম নেই তবে টাকা অর্জিত হবে না ফলে প্রিমিয়ামের টাকা জমা দিতে পারবে না। তার বীমা ব্যবস্থাও বাতিল হয়ে যাবে।

জুয়া খেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ টিকেট ক্রয় করে কিন্তু সবাই জয়ী হয় না। জয়ী ব্যক্তির জন্যে খুব সীমিত সংখ্যক পরিমাণ টাকা থাকে। এ টাকা টিকেট বিক্রি টাকা থেকে যোগান দেয়া হয়। যারা জয় লাভ করতে পেলনা তারা শুধু দিলই। আর যারা জয় লাভ করে টাকা পেল তার কিন্তু কোন ঝুকির সম্মুখিন ও নয় যে তারা সাহায্য পেতে পারে। যারা পেল তারা এক সাথে অনেক পেল কোন কষ্ট পরিশ্রম ছাড়াই, কোন সামাজিক কল্যাণকর অবদান না রেখেই এবং কোন রূপ সাদৃশ্য পূর্ণ বিনিময় না দিয়েই। ফলে তাদের মধ্যে অর্থ উপার্জনের ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছাড়াই বিপুল অর্থ লাভের লোভ অত্যান্ত প্রবল হয়ে দেখা দেয়। উত্তর কালে এ জুয়াড়ীরাই নানা ভাবে সমাজকে শোষণ করে। চুরি -ডাকাতি করে এক সাথে অনেক সম্পদ আত্মসাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এ অভ্যাসই সংক্রামক রোগের মতই গোটা সমাজকে গ্রাস করে। ফলে জাতীয় জীবনে মারাত্মক পরিণতি ও সর্বাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। যে বীমা ব্যবস্থায় বীমাগ্রাহক প্রিমিয়াম জমা দিয়েই যাবে, দুর্ঘটনা না ঘটলে কোন কিছুই পাবে না, এরূপ বীমা ব্যবস্থা ইসলাম সমর্থন করে না। এরূপ বীমা ব্যবস্থায় বীমা কোম্পানীই লাভবান হয়। আমরা এ বীমা ব্যবস্থা সমর্থন করি না।

------- ০০ঃ------

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ বীমা ও ইসলাম

আমাদের দেশে প্রচলিত সম্পত্তি বীমা যেমন অগ্নিবীমা ও গাড়ী বীমা জুয়ার সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ।জুয়াতে যারা জয়লাভ করল তারা অনেক পেল আর অধিকাংশই জয় লাভ না করে তাদের টিকেটের টাকা ও হারাতে হল। তেমন ভাবে সম্পত্তি বীমার ক্ষেত্রে যারা বীমা করে প্রিমিয়াম দের তাদের মধ্যে ১/২% বিপদের সম্মুখিন হয়ে ক্ষতি পূরণ পেয়ে থাকেন আর অন্যরা আশংকা অনুযায়ী বিপদের সম্মুখিন হয় না এবং প্রিমিয়ামের বিনিময়ে কিছুই পায়না । তাদেরকে যে পরিমাণ টাকার বীমা করেছে সে টাকা বীমা কোম্পানীকে দিতে হবে। এর বিপরীতে তারা কিছুই পায় না । আমি পূর্বেই বলেছি যে, সম্পত্তির বীমার ক্ষেত্রে ১/২% লোক ঝুঁকির সম্মুখিন হয়। বাকীরা কোন ঝুকির সম্মুখিন হয় না। আর ঝুকির সম্মুখিন হয় না বলে প্রিমিয়ামের কিস্তির টাকা দিয়ে তারা শূন্য হতে ফিরে যেতে হয়।আর এ দিকে বীমা কোম্পনী গুলো পাহাড় পরিমাণ টাকার মালিক হয়ে যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা গ্রহণ যোগ্য নয় এবং এর মধ্যে আর জুয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ইসলাম সমর্থিত সম্পত্তি বীমা ঃ ইসলামে বীমা হচ্ছে গোষ্ঠি বদ্ধ ভাবে কোন ঝুকি মোকাবিলার উত্তম পন্থা কোরআর শরীফ আল্লাহ বলেছেন[১]- وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - واتقوا الله - ان الله شديد العقاب -

অর্থাৎ সৎকর্ম ও খোদা ভিতিতে একে অপরের সাহায্যকর । পাপ ও সীমা লংঘনে একে অন্যের সাহায্যকর না । আল্লাহ কে ভয় কর। নিশ্চাই আল্লাহ তালা কঠোর শাস্তি দাতা।

কোরআন শরীফে যে সাহায্য মুলক সংগঠনের কথা বলা হয়েছে তা মানব কল্যাণার্থে হতে হবে । সম্পদের পাহড় গড়ে তোলার মানসিকতার মাধ্যমে নয়।

সকল ক্ষেত্রেই ইসলামী বীমার মূলনীতি হতে হবে একটি, চাই তা জীবন বীমা হোকে বা সম্পত্তি বীমাই হোক। প্রিমিয়ামের টাকা দু'টি ফান্ডে জমা হবে। বড় অংশটি দ্বারা পার্টিসিপেন্ট ফান্ড গঠন করা হবে। আর ছোট অংশটি দ্বারা তাবাররুউন বা অনুদান ফান্ড গঠিত হবে। যে পলিসি হোল্ডার ক্ষতি গ্রস্ত হয়ে বিপদে পড়বে তাকে তাবাররুইন ফান্ড থেকে ক্ষতি

---

[১] আল কুরআন সুরা আল মায়েদাহ- আয়াত- ২

Dhaka University Institutional Repository

পূরণের ব্যবস্থা করা হবে। আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তাকে মেয়াদ শেষে প্রিমিয়ামের টাকা লাভ সহ ফেরত দিবে।

জীবন বীমার ক্ষেত্রে যদি এ পদ্ধতি অনুস্মরণ করা সম্ভব হয় তা হলে সম্পত্তি বীমার ক্ষেত্রে কেন সম্ভব হবে না?

সম্পত্তি বীমার ক্ষেত্রে বীমার গ্রাহক যদি অগ্নিকান্ড বা গাড়ী দুর্ঘটনা জনিত কোন কারণে ক্ষতির সম্মুখিন হয় তবে তাকে ঐ তাবাররুউন ফান্ড থেকে ক্ষতিপুরণ প্রদান করতে হবে। আর যারা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়ে থাকে তাকে মেয়াদান্তে প্রিমিয়ামের টাকা লাভ সহ ফেরৎ দিতে হবে। অন্যথায় তাদের অধিকার হরণ করে বীমা কোম্পানী সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলবে আর তারা খালি হাতে ফিরে যাবে তা কখনো সমর্থন করা যায় না। আর এ বীমা ও জুয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। এ জন্যেই আল্লাহ তায়ালা আয়াতের শেষে বলেছেন তোমরা আল্লাকে ভয় কর। নিশ্চই তিনি কঠোর শাস্তি দাতা।

বীমা কোম্পানী যদি এ ক্ষেতে প্রশ্ন তুলে যে, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই তাদের প্রিমিয়ামের টাকা ফেরৎ দিলে কোম্পানীর কোন লাভ থাকবেনা বরং দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে। তবে আমি বলব এটি একটি অসার যুক্তি। যদি প্রিমিয়ামের টাকা লাভসহ ফেরৎ দিলে বীমা কোম্পানী ব্যবসা কম হবে মনে করে তাহলে ব্যবসার অংশ বাদ দিয়ে প্রিমিয়ামের মূল টাকা তো ফেরৎ দিতে হবে। মূল প্রিমিয়ামের টাকা দিয়ে মুনাফা করে তা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি পূরণে ব্যবস্থা করবে।

ঝুকি সম্পর্কে কেউ জানেনা। কখন আসবে তাও কেউ ধারাণা করতে পারে না। চাই তা জীবন বীমার ক্ষেত্রে হোক বা সম্পত্তি বীমার ক্ষেত্রে হোক উভয়ই সমান যদি ইসলামী জীবন বীমার ক্ষেত্রে কোম্পানী গুলো যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি তাদের প্রিমিয়ামের টাকা ব্যবসা সহ ফেরৎ দিয়ে দেশের শীর্ষ পর্যায়ের ব্যবসা কোম্পানী হতে পারে, তা হলে সম্পত্তি বীমার ক্ষেত্রে তা সম্ভব হবে না কেন?

ইসলামে অনুমদিত সম্পত্তি বীমা হল কেউ দূর্ঘটনা জনিত কারণে সম্পদের ক্ষতির সম্মুখিন হলে তাকে যেমন ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে। তদ্রুপ ভাবে যারা ক্ষতি গ্রস্ত হয় না মেয়াদান্তে তাদের প্রিমিয়ামের টাকা ফেরৎ দিতে হবে। তা হলেই জুয়ার সাথে

কোনরূপেরই সাদৃশ্যের অবকাশ থাকে না। বর্তমানে বাংলাদেশে ইসলামী সাধারণ জীবন বীমা ব্যবস্থা কে ইসলাম সম্মত করতে নিম্ন লিখিত দু'টি পদ্ধতির যে কোন একটি অবলম্বন করা যায়।

এক ঃ ইসলামী জীবন বীমার ন্যায় প্রত্যেক বীমা গ্রাহকের জন্যে কোম্পানী দু'টি ফান্ডে পরিচালনা করবে। একটি Participant Account বা গ্রাহকের নিজস্ব একাউন্ট ফান্ড। এ ফান্ডে প্রিমিয়ামের সিংহভাগ জমা হবে। বীমা কোম্পানীর প্রশাসনিক ও বীমা সংক্রান্ত আনুষাঙ্গিক খরচ Participant Account থেকে ব্যয় করা হবে। প্রিমিয়ামের টাকা বিনিয়োগ করে যে মুনাফা অর্জিত হবে তা Participant Account ফান্ডে জমা হবে। অপরটি তাবাররুউন বা অনুদান ফান্ড। এ ফান্ডে প্রিমিয়ামের সামান্যতম অংশ জমা হবে। দূর্ঘটনা জনিত কারণে ক্ষতির ক্ষতি পূরণ বা Claim বা দাবী পরিশোধ করা হবে এ তাবাররুউন ফান্ড থেকে। Claim বা দাবী না থাকলে বীমা গ্রাহক এ ফান্ড থেকে কিছুই পাবে না। কারণ সে তো তাবাররুউন ফান্ডে চুক্তি মোতাবেক যা জমা দিয়েছে তা অনুদান হিসেবে অন্য বিপদ গ্রস্ত মুসলিম ভাই এর সহায়তার লক্ষ্যে জমা দিয়েছে। আর দান করা কোন কিছু ফেরৎ নেয়ার বিধান ইসলামে নেই। আর যে সব বীমা গ্রাহক জীবনে কোন দুর্ঘটনা জনিক কারণে ক্ষতির সম্মুখিন না হয় বা কোন Claim না করে তারা বীমা কোম্পানীর প্রাশাসনিক ও বীমা সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বাদ দিয়ে Participant Account ফান্ড জমাকৃত প্রিমিয়ামের টাকা লাভ সহ মেয়াদান্তে ফেরৎ পাবে।

দুই ঃ অথবা মালয়েশিয়ার ইসলামী বীমা কোম্পানী গুলোর অনুকরণে বীমা গ্রাহকের জন্যে একটি হিসাব ফান্ড পরিচালনা করবে। বর্তমানে দেশে প্রচলিত যে Participant Account ফান্ড আছে তা ঠিক থাকবে। Claim বা দাবী সমূহ পরিশোধের পর বার্ষিক আয়-ব্যয় হিসাব করে যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে তার একটি অংশ কোম্পানীর লাভ হিসেবে রেখে বাকী টাকা বীমা গ্রহীতাদেরকে ফেরৎ দিবে।

কোন বীমা কোম্পানী ইসলামী আইন অনুস্বরণ না করে তাকে ইসলামী বীমা কোম্পানী বলে প্রচার করা প্রতারণার সামিল। আর প্রতারণা পূর্ণ ব্যবস্থা ইসলাম সমর্থন করে না।

Dhaka University Institutional Repository

তাফসির কারক গণ আয়াতে উল্লেখিত "বির" শব্দের ব্যাখ্যার বলেছেন এর দ্বারা জন কল্যাণ মুলক কাজকে বুঝানো হয়েছে। যার মাধ্যমে জনগণ সন্তুষ্টও উপকারী হতে পারে। আর " তাকওয়া" শব্দের অর্থ মন্দ কাজ বর্জন করা। "ইসমি" শব্দের অর্থ যে কোন পাপকর্ম, তা অধিকার সম্পর্কিত বা ইবাদ সম্পর্কিত হোক। উদওয়ান শব্দের অর্থ সীমালংঘন করা।[৩]

সৎকর্মও খোদাভীতিতে সাহায্য করার জন্যে রাসুল (সঃ) বলেছেন[৪]-

الدال على الخير كفاعله - ع

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু সাওয়ার পাবে, নিজ সৎ কর্মটি করলে যতটুকু পেত",

তিবরানীর রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে রাসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অত্যাচরীর সাথে সাহায্যার্থে বের হয় সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়"। এ ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী মনিষীগণ অত্যাচারী বাদশাহের অধীনে চাকুরীর পদ গ্রহণ করা থেকে কঠোর ভাবে বিরত রয়েছেন।[৫]

রুহুল মায়ানী তে এ প্রসঙ্গে একটি হাদিসে বর্ণনা করেছেন। রাসুল (সঃ) বলেছেন কেয়ামতের দিন ডাক দেয়া হবে। হে অত্যাচারীরা ও তাদের সাহায্যকারীরা তোমরা কোথায়? অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত ও কলম ঠিক করে দিয়েছে, তাদের কে ও একটি লৌহ শবাধারে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

জনকল্যাণমূলক কাজে সহায়তার মাধ্যমে মানবতার উন্নতি সাধনে আল্লাহ্ সন্তুষ্টি অর্জন করা আমাদের প্রস্তাবিত বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব।

---

[৩] তাফসীরে মারেফুল কুরআন, বাংলা সংস্করণ, পৃঃ ৩০৬
[৪] তাফসীরে ইবনে কাসির।
[৫] তাফসীরে মারেফুল কুরআন, বাংলা সংস্করণ, পৃঃ ৩০৬

Dhaka University Institutional Repository

তাওয়াক্কুল ও বীমা

আমাদের মাঝে কিছু অতি আবেগী ব্যক্তি মনে করে যে, বীমা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি। আল্লাহ জীবন দাতা, মৃত্যু প্রদান কারী ও রিজিক দাতা। আমরা আল্লাহর উপর পূর্ণ মাত্রায় ভরসা করলে সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান তিনি করে দিবেন। আল্লাহর উপর যার ভরসা থাকবে না তিনি বীমা করতে পারেন। আমরা কি আল্লাহর সীমাহীন করুণার উপর ভরসা করতে পারিনা? আল্লাহর উপর নির্ভর না করে কেন আমরা বিপদে মানব রচিত বিধিমালা পদ্ধতি বা সংগঠনের উপর নির্ভর করব? এগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয় মজাদার ও বিব্রত কর প্রশ্ন।

সমাধান ঃ আল্লাহর উপর পরিপুর্ন তাওয়াক্কুল করা ইমানের শর্ত যার মনে সর্ব ব্যাপারে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল থাকবে না; আল্লাহর প্রতি তার ইমান ও থাকবেন না, আল্লাহ ঘোষণা করেছেন[৬] - ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه -

অর্থাৎ যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার নিস্কৃতির ব্যবস্থা করে দেন এবং অকল্পনীয় পথে তাকে রিজিক দিয়ে থাকেন, আর যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহই তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যান।

তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যায় হযরত উমর রাসুল (সঃ) থেকে বর্ননা করেন যে, রাসুল (সঃ) বলেছেন[৭]- ولو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا -

অর্থাৎ তোমরা যদি প্রকৃত ভাবে আল্লাহর উপর ভরসা কর তা হলে তোমাদেরকে এমন ভাবে রিযিক দেয়া হবে যেমন রিজিক দেয়া হয় পক্ষীকূলকে তারা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় পেট ভরে বাসায় ফিরে আসে।

---

[৬] আল কুরআন সুরা আত্‌আলাক, আয়াত ২-৩

[৭] তিরমিজি ও ইবনে মাজা

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল (সঃ) এর এ হাদিসটি থেকে তাওয়াক্কুলের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে তাওয়াক্কুলের প্রকৃত ও বাস্তব রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠে। পক্ষীকুল আল্লাহর উপর ভরসা করে রিযিকের সন্ধানে অজানা পথে বের হয়ে যায়। আহারের জন্যে চেষ্টা সাধনা করতে থাকে তার পর আল্লাহ্ তাদের চাহিদাপূরণ করেন। হাদিসে একথা বলা হয় নাই যে, পক্ষীকুল তাওয়াক্কুল করে তাদের বাসাতে বসে থাকে,আর আল্লাহর তাদেরকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন। কেউ যদি মনে করেন চেষ্টা তদবীর না করে আল্লাহর উপর ভরসা করলেই আল্লাহ্ রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন। ত হলে তা হবে হাদিসের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। আর হাদিসের পরিপন্থি মনোভাব পোষণ কারী রাসুল (সঃ) এর উম্মত হতে পারেন না।

সন্দেহ নেই আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করাই তাওহীদে ইমানের অঙ্গ । কিন্তু সে তাওয়াক্কুলের অর্থ নিস্কৃয়তা বা কর্ম বিমুখতা নয়। কোন কাজ কর্ম না করে ঘরের বাইরে না এসে বসে থাকা নয়। রাসুল (সঃ) এর হাদিসে বলা হয়েছে আল্লাহর উপর তোমাদের তাওয়াক্কুল অবশ্যই রাখতে হবে। তিনিই একমাত্র দাতা, তিনি দিলে বান্দা পাবে। আর তিনি না দিলে দেয়ারমত কেউ নেই। তাওয়াক্কুল হতে হবে পক্ষীকুলের মত। ওরা আল্লাহর উপর পরি পূর্ণ ভরসা করে তাদের বাসাতে বসে থাকে না বরং খাদ্যের সন্ধানে ভোরেই নীড় ছেড়ে বের হয়ে পড়ে এবং সারা দিন খাদ্যের সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত থাকে একস্থানে না পেলে অন্য স্থানে চলে যায়। ফলে সন্ধ্যাবেলা পেট ভরে খাদ্য নিয়ে বাসস্থানে ফিরে আসে। তাওয়াক্কুলের সঠিক অর্থ হল আল্লাহ্র উপর ভরসা করে নিস্কৃয় হয়ে বসে থাকলে চলবে না বরং তাওয়াক্কুল সহকারে তোমাদেরকে রুযি রোজগারের সন্ধানে বের হয়ে আসতে হবে। সেক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের মন মগজ ও দেহের পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করতেহবে। চেষ্টা সাধনা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন[৮] - فاذا قضيت الصلوة فانتشروا فى الارض
وابتغوا من فضل الله -

অর্থাৎ অতপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর। এ রিজিকে সন্ধানে বাস্তব ভাবে কোন না কোন উপায় ও পন্থা অবলম্বন করতে

---

[৮] আল কুরআন, সুরা আল-জুমুআহ আয়াত - ১০

Dhaka University Institutional Repository

হবে। আর দৃঢ় প্রত্যয় রাখতে হবে যে আল্লাহ অবশ্যই রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন। এটাই হচ্ছে তাওয়াক্কুলের যথার্থতা ।

রাসুল (সঃ) আরো একটি হাদিসের মাধ্যমে তাওয়াক্কুলের মূল তাৎপর্য পাওয়া যায়।

হযরত আমর বিন উমাইয়্যাহ জামরী রাসুল (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন -

أ أرسل ناقتي وأتوكل أم أقيد وأتوكل ؟

অর্থাৎ আমি যে উটটিতে সাওয়ার হয়ে আপনার দরবারে উপস্থিত হয়েছি। সেটিকে ছেড়ে দিয়ে কি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করব না বেধে রেখে করব? উত্তরে রাসুল (সঃ) বললেন[৯]- — بل قيد وتوكل

অর্থাৎ বরং উটটি রশি দিয়ে বাধ তারপর তাওয়াক্কুল কর।

অন্য হাদিসে রাসুল (সঃ) থেকে এ ভাবে বর্ণনা আছে[১০]- عن انس بن مالك رض قال قال رجل يا رسول الله اعقلها واتوكل قال اعقلها وتوكل - (الترمذي) -

অর্থাৎ হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল হে আল্লাহর রাসুল (সঃ) আমি কি উঠকে বাধব এবং তাওয়াক্কুল করবে? উত্তরে রাসুল (সঃ) বলেছে বাধ এবং তাওয়াক্কুল কর।

হযরত উমর (রাঃ) কে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে প্রশ্ন করা তিনি বলেছেন জমি চাষ দিয়ে বীজ বপন করে জমি থেকে আগাছা পরিস্কার করার পর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর।

আল্লামাহ ইবনে কাইয়্যুম এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে, রাসুল (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) তাওয়াক্কুলের বাস্তব প্রতি মূর্তি ছিলেন। কিন্তু তারা যখন কোন যুদ্ধে যেতেন তখন অস্ত্রশাস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত হয়েযেতেন। রাসুল (সঃ) মক্কা বিজয় কালে নগরে প্রবেশ করতে মাথায় লৌহ শিরস্থান ধারণ করেছিলেন। তার এ কাজ তাওয়াক্কুল পরিপন্থি ছিলনা । এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন[১১]- ان تمام التوكل استعمال الاسباب التي نصبها

---

[৯] ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা মাওঃ মুহাম্মদ আঃ রহিম পৃ: ১০৭

[১০] আততির মিজি, The thesis Insurance with a comparative analysis between comman Law and Islamic legal thought 1997. Dr. Masum Billah P. 66.

[১১] যাদুল মায়াদ ৩য় খন্ড। পৃ: ৪৮০ ।

Dhaka University Institutional Repository

الله لمسببا تها قدرا وشرطا -

অর্থাৎ পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল হল বহ্যিক উপায় উপকরণ সবই গ্রহণ করা। আল্লাহ আল্লাহ নিজেই প্রতিটি কাজের জন্যে যে শর্ত ও পরিমাপ নির্ধারণ করেছেন।

তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আলমুখতার মিন কুনুযিস সুন্নাতিন নবুয়্যাহ কিতাবে উল্লেখ আছে, "তাওয়াক্কুল" (আল্লাহর প্রতিপূর্ণ ভরসা) মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। সুফী বুজুর্গগণ এর স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে এতটুকু বুঝা দরকার যে, বাহ্যিক উপায় উপকরণ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকার নাম তাওয়াক্কুল নয়। বরং তাওয়াক্কুল হল সামর্থ অনুযায়ী যাবতীয় বাহ্যিক উপায় অবলম্বন করার পর ফলাফলের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা এবং বাহ্যিক উপায়াদির জন্যে গর্ব না করে আল্লাহর উপায় ভরসা করে। এ ব্যাপারে নবী করিম (সঃ) এর উত্তম নমুনা আমাদের সামনে রয়েছে। স্বয়ং মুসলিম বাহিনীকে যোদ্ধাস্ত্রে প্রস্তুত করা, সামর্থ অনুযায়ী অস্ত্র-শস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণাদি সংগ্রহ করা, রণাঙ্গঁনে পৌছে স্থানোপযোগী যুদ্ধের মানচিত্র তৈরী করা, বিভিন্ন বুহ্য রচনা করে সাহাবায়ে কেরামকে তথায় সংস্থাপিত করা ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠ ব্যবস্থা স্বহস্তে সম্পাদন করে প্রকারান্তরে একথা বলে দিয়েছেন যে, বাহ্যিক উপায়দি ও আল্লাহর অবদান। এগুলো থেকে সম্পর্কচ্ছেদ কর তাওয়াক্কুল নয়। এ ক্ষেত্রে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্য এতটুকু যে, মুসলমানরা সব সাজ সরঞ্জাম বৈষয়িক শক্তি সামর্থ অনুযায়ী সংগ্রহ করার পরও এক মাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে, পক্ষান্তরে অমুসলিম এ আধ্যাত্মিকতা থেকে বঞ্চিত। তারা বৈষয়িক শক্তির উপরই ভরসা করে।[১২]

বাহ্যিক ও পার্থিব উপকরণ সমূহ আল্লাহ তা'য়ালার অনুগ্রহের দান। এগুলো বর্জন করা তা অকৃতজ্ঞতারই নামান্তর। তদুপরি স্বাভাবিক উপকরণাদি বর্জন করে তাওয়াক্কুল করা রাসুলে কারিম (সঃ) এর সুন্নত নয়।[১৩]

আল মুখতার মিন কুনুযিস সুন্নাতিন নবুয়্যাহ কিতাবে উল্লেখ আছে[১৪] - ان التوكل على

---

[১২] তাফসীরে মারেফুল কুরআন, বাংলা সংস্করণ, পৃঃ ২০২

[১৩] তাফসীরে মারেফুল কুরআন, বাংলা সংস্করণ, পৃঃ ২১৭

[১৪] আল মোখতার মিন কুনুযিস সুন্নাতিন নবুয়্যাহ, পৃষ্ঠা নং ১৬।

Dhaka University Institutional Repository

التوكل ليس في ترك الاسباب التي وضعها الله، بل التوكل
هو تفويض الامر الى الله في انجاح هذه الاسباب -

অর্থাৎ আল্লার দেয়া বাস্তব উপায় উপকরণ পরিহার করা তাওয়াক্কুল নয়। বরং সে গুলো গ্রহণ পূর্বক সাফল্যের ব্যাপার আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই হল প্রকৃত তাওয়াক্কুল।

বুখারী শরীফ উল্লেখ আছে, রাসুল (সঃ) অহী লাভের পূর্বে ক্রমাগত কয়েক দিন হেরা গুহায় অবস্থান করেছেন। তখন তিনি প্রয়োজনীয় খাদ্য পানীয় সঙ্গে নিয়ে যেতেন[১৫], প্রয়োজনীয় জীবন উপকরণ সঙ্গে নেয়া তাওয়াক্কুল পরিপন্থি ছিল না।

সুরা মুলুকের ১৫নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন[১৬] - هو الذي جعل لكم الارض
ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور -

অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে মসৃণ-সর্বসহা বানিয়েছেন। তোমরা তার কাধে তথা উপরে চলাচল কর এবং তার পক্ষ থেকে পাওয়া রিযিক খাও। তারই নিকট পুনরুজীবন হবে।

এ আয়াতে নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকার পরিবর্তে যমীনে চলাচল করে রিযিকের সন্ধান করার জন্যে বলা হয়েছে। অনুসন্ধান শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে উৎপাদন করে রিযিকের ব্যবস্থা করতে হবে। যে ব্যক্তি অনুসন্ধান ও সাধানা করবে আল্লাহ তায়ালা তাকেই রিযিক দান করবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন[১৭] - وآتاكم من كل
ما سألتموه وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها -

অর্থাৎ যে সব বস্তু তোমরা চেয়েছ তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা কর তবে তা শেষ করতে পারবেনা।

গোষ্ঠি বদ্ধ হয়ে জীবন যাপন ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য ক্ষতি ঝুকি ও বিপদের সহযোগিতার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসার লক্ষ্যে বীমা সংস্থা গড়ে তোলার সাথে সাথে

---

[১৫] আল বুখারী, কিতাবুল ওহি, প্রথম খন্ড।
[১৬] আল কুরআন, সুরা আল মুলুক, আয়াত - ১৫
[১৭] আল কুরআন, সুরা ইব্রাহিম, আয়াত, ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করাই হচ্ছে ইসলাম সমর্থিত তাওয়াক্কুল । আমরা এ তাওয়াক্কুলেরই সমর্থক। তাই বীমা ও তাওয়াক্কুলের মাঝে কোন বৈপরিত্ব নেই।

এ বিষয়ে আল্লাহর রাসুল (সঃ) ও উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। রাসুল (সঃ) এর হাদিস[১৬] - عن صفوان بن سليم رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعى على الارملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله او كالذى يصوم النهار ويقوم الليل -(البخارى)

অর্থাৎ হযরত সাফওয়ান বিন সুলাইম হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন রাসুল (সঃ) বলেছেন বিধবা ও মিসকীনদের সাহায্য কাজে চেষ্টাকারী বা উদ্যোগ গ্রহণকারী বা ব্যবস্থাকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ কারী ব্যক্তি সমমর্যাদা সম্পন্ন। অথবা ঐ ব্যক্তিরমত যে দিনে রোযা রাখে ও রাতে দাড়িয়ে আল্লাহর ইবাদত করে।

অতএব এ কথ অকাট্য ভাবে প্রমাণিত যে বীমা করা তাওয়াক্কুলের এক বিন্দু পরিপন্থি নয়।

---

১৬ আল বুখারী, কিতাবুল আদব, ইবনে মাজা, পৃ: ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

বীমা ও মীরাস

বীমার বিরুদ্ধে আরো একটি ধর্মীয় যুক্তি হল যে, বীমার মাধ্যমে উত্তরাধীকারী আইনকে লংঘন করা হয়। কারণ বীমাকারী যে কোন একজন কে বীমার উত্তরাধীকারী বা নমিনী নিধারণ করে থাকে। বীমাকারী যদি মৃত্যু বরণ করে তা বীমার সমস্ত টাকা নমিনি পেয়ে থাকে। এতে অন্যান্য উত্তরাধীকারী গণ বঞ্চিত হয়ে থাকে। অথচ মৃত ব্যক্তির বীমাকৃত টাকার হকদার অন্যান্য ওয়ারিশগণও।

আমরা বলব, বীমার নমিনী পদ্ধতি সংস্কার করে মিরাস নীতি ঠিক রাখা সম্ভব। বীমা কোম্পানীর পক্ষ থেকে বীমা গ্রাহককে তার ওয়ারিশদের মধ্য থেকে গুরুত্ব পূর্ণ কাউকে নমিনী করার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা দিতে হবে এবং ওয়ারিশদের ওয়ারিশ সত্ত্বের অংশ উল্লেখ থাকতে হবে।

বীমা গ্রহীতার মৃত্যু উত্তর দাবি পরিশোধের সময় বীমা কোম্পানী নমিনি সহ অন্যান্য ওয়ারিশদের উপস্থিত রেখে দাবি পরিশোধ করবে।

বীমা করার সময়ই বীমা গ্রহীতা থেকে ওয়ারিশদের তালিকা দাখিল বাধ্যতামুলক করতে হবে।

বীমা কোম্পানী বীমা গ্রহণকারী থেকে এ অঙ্গীকার পত্র গ্রহণ করবে যে বীমা গ্রাহকের মৃত্যু উত্তর নমিনী যদি অন্যান্য ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার মানসিকতা পোষণ করে বা কোন ওয়ারিশ যদি নমিনীর ব্যাপারে কোন প্রকার অভিযোগ দাখিল করে তাবে বীমা কোম্পানী ইসলামী শরীয়াত মোতাবেক উত্তরাধীকারী আইন অনুযায়ী বীমার দাবী ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার ক্ষমতা থাকবে।

আলোচ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বীমার দাবীকে ইসলামের মীরাসী আইনের সাথে সামঞ্জস্যশীল করা যায়।

-----------OO-------------

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমাও আল ঘারার

আল ঘারার একটি আরবী শব্দ। যার অর্থ হল ধোকা বা প্রতারণা করা।

التعريض للهلاك[১৯]

অর্থাৎ কোন কিছুকে ধ্বংসের জন্যে পেশ করা।

অনিশ্চিত বিষয়কে আল ঘারার বলা হয়ে থাকে। যে সকল লেন-দেনে অনিশ্চয়তার উপাদান থেকে তাকেও আল ঘারার বলা হয়ে থাকে। আল্লামাহ্ ইবনুল আসির বলেন যে লেন-দেনের বাহ্যিক দিক আকর্ষণীয় আর অভ্যন্তরিন দিক অপছন্দনীয় তাকে আল-ঘারার বলে। ইবনে আরেফা বলেন যে লেনদেনে বাহ্যিক দিক থেকে ক্রেতাগণ প্রতারিত হয় আর আভ্যন্তরিন দিক থাকে অজানা তা-ই ঘারার।

ইবনে হাজাম বলেন, একজন ক্রেতা ক্রয়কৃত মাল সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ক্রয় করা আর বিক্রেতার নিশ্চিত না হয়ে মাল বিক্রি করাকে ঘারার বলে।

হানাফী মাযহাবে যে লেনদেনের ফলাফল গোপন তাকে ঘারার বলে।

শাফেয়ী মাযহাবে যে, লেনদেনের প্রকৃতি ও ফলাফল উভয়ই গোপন তাকে ঘারার বলে।

হাম্বলী মাযহাবে ঘারার বলে এমন লেনদেনকে যার প্রকৃত অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা নিয়ে সন্দেহ থাকা।

অধ্যাপক মুস্তফা আল জারকা সুন্দর করে বলেছেন, ঘারার হচ্ছে সম্ভাব্য বস্তুর বিক্রয়, যার অস্তিত্ব ও গুণাবলী নিশ্চিত ভাবে জানা নেই। কারণ সেখানে এমন ঝুকি বিদ্যমান যা ব্যবসাকে জুয়া খেলার শামিল করে তোলে।

আর ঘারার এর হুকুম ঃ

অনিশ্চয়তার উপাদান থাকে এমন সব লেনদেন ইসলামে নিষিদ্ধ ইসলামী আইন বিজ্ঞানে অনিশ্চয়তামূলক কোন উপাদান ব্যবসায়িক চুক্তিকে বাতিল করে দেয়।

---

[১৯] আল মানজেদ, পৃ. ৫৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

মূলতঃ আল ঘারার জাহেলী যুগের ক্রয় - বিক্রয়ের একটি বিশেষ পদ্ধতি। এ লেন-দেনের মধ্যে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই ধোকা ও প্রতারণার শিকার হয়। এ ধরণের লেনদেন ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ । এ রকম লেনদেন করতে রাসূল (সাঃ) কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন[১০] - عن ابي هريرة رض قال نهى رسول الله ص عن بيع الحصاة وبيع الغرر -

অর্থাৎ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূল (সাঃ) কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে এবং ধোকা ও প্রতারণামূলক ক্রয় বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।

রাসূল (সাঃ) থেকে অন্য একটি হাদিস[১১]- عن سعيد ابن المسيب رض ان رسول الله ص نهى عن بيع الغرر -

অর্থাৎ হযরত সাইদ ইবনে মুসাইয়ার হতে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল (সাঃ) প্রতারনা বা ধোকাবাজি রূপ বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূল (সাঃ) এক শস্য বিক্রেতার নিকট দিয়ে পথ অতিক্রম করার সময় বিক্রেতা জিজ্ঞাসা করলেন বেচাকিনা কেমন হচ্ছে? লোকটির উত্তরের পর রাসূল (সাঃ) শস্যের স্তূপে নিজ হাত প্রবেশ করিয়ে বুঝতে পারলেন শস্য স্তুপের ভিতরে ভিজা। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সাঃ) বললেন যে, লোক অন্যকে প্রতারিত করে সে আমার উম্মৎ নয়। সুতরাং ঘারার ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম।

ঘারার সম্পর্কে ফিক্‌হ একাডেমির বক্তব্য The Commercial Insurance contract with the fixed premium offered by commercial Insurance companies is a contract that contains excessive and hence contract Invalidating gharar. It is forbidden by the shariah.[১২] "প্রচলিত বাণিজ্যিক বীমা চুক্তির অধীনে বীমা কোম্পানী গুলো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম গ্রহণ করে,

---

[১০] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল বুয়ু।
[১১] আলমুয়াত্তা, ইমাম মালেক (রঃ) কিতাবুল বুয়ু।
[১২] প্রবন্ধ, ডঃ মাহমুদ আহমদ - ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে. আর এটিই হল ঘারার। ঘারার ঐ চুক্তিকে বাতিল করে দেয়া। যা ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ।

এ অনিশ্চয়তার সূত্র ধরে অনেকে মনে করেন যে, বীমা ব্যবস্থার মধ্যেও ঘারার পাওয়া যায়। সুতরাং বীমা ইসলামে জায়েজ হতে পারে না।

আমাদের প্রস্তাবিত বীমা ঘারারযুক্ত প্রচলিত বীমা নয়। পাশ্চাত্য বীমার মধ্যেই অনিশ্চয়তামূলক ব্যবস্থা থাকে। এ বীমার সম্পূর্ণ তার বিরোধী। প্রচলিত এ জাতীয় চুক্তিপত্রে বীমাকারী একটি নির্ধারিত অংকে প্রিমিয়াম প্রদান করে। এর বিপরীতে বীমা কোম্পানী আশ্বাস প্রদান করে কোন দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষয় ক্ষতি হলে নির্দিষ্ট অংকের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। কিন্তু তাকে দেয়া এ ক্ষতিপূরণের টাকা কিভাবে অর্জিত হবে তা জানানো হয় না। এটিই হল ঘারার। আর এরূপ পদ্ধতি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইসলামী বীমার সকল বিষয়ই গ্রাহকসহ সকলের নিকট স্পষ্ট হতে হবে। ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক বীমা কোম্পানী পরিচালনার জন্যে তিনটি বিষয় ঘারার (অনিশ্চয়তা), মাইসার (জুয়া) ও রিবা (সুদ) দুর করার নিশ্চায়তার বিধান থাকবে। ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠা করতে হলে বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে ঘারার বিষয়টি সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করতে হবে। তাছাড়া ইসলামী বীমা চুক্তির মধ্যে ঘারার এর কোন উপাদান থাকার সুযোগ নেই। প্রিমিয়াম আদায় কালেই গ্রাহককে বীমা সংক্রান্ত সব বিষয় স্পষ্ট করে বলতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ গ্রাহকের জমাকৃত টাকার নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামী বীমা কোম্পানীর দায়িত্ব। তৃতীয়তঃ বিনিয়োগ করার পর লভ্যাংশ অংশ গ্রহণ কারীদের কাছে পৌছানের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। এ সকল বিষয় বলতে খুব স্বাভাবিক মনে হলেও এর ফলাফল সুদুর প্রসারী।

আর্থিক লেনদেন শর্ত সুস্পষ্ট হতে হবে। আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়ে ফলাফল সংক্রান্ত কোনরূপ অনিশ্চয়তা হারাম। শরীয়াতের পরিভাষায় আর্থিক লেন-দেনের অস্পষ্টতা বা অনিশ্চয়তাকে বলা হয় আল - ঘারার। মূল কথা হল লেনদেনের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা পরিত্যাজ্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন[২৩] - ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون -

---

[২৩] আল কুরআন সুরা আল-বাকারা, আয়াত - ৪২

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং জানা সত্ত্বেও সত্যকে তোমরা গোপন করো না।

বীমা চুক্তিতে কোনরূপ মিথ্যা প্রলোভন বা অনিশ্চয়তা থাকলে পরবর্তীতে বীমা কোম্পানী ও গ্রাহকদের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি করে। এমনকি আদালতে মামলা ও দায়ের করা হয়। এতে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। আর যে লেনদেন ঝগড়ার সৃষ্টি করে তা ইসলামে অনুমোদিত নয়। এ সম্পর্কে হেদায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে[২৪] - الجهالة مفضية الى المنازعة فيمتنع التسليم والتسلم وكل جهالة هذه صفته تمنع الجواز هذا هو الاصل -

অর্থাৎ অজ্ঞতা বা অনিশ্চয়তা ঝগড়ার দিকে নিয়ে যায়, এ অজ্ঞতাজনিত লেন-দেনে মূল্য সমর্পন ও মাল গ্রহণ করাকে নিষিদ্ধ করে। এ ধরণের প্রত্যেক অজ্ঞতা বা অনিশ্চয়তা বৈধতাকে বাধাগ্রস্থ করে। এটিই লেনদেনের মূলনীতি।

আল্লামাহ্ ইমাম নবুবী আল ঘারার এর কয়েকটি শ্রেণী উল্লেখ করেছেন।

১. হস্তান্তরের অযোগ্য কোন বস্তু বিক্রি করা।

২. স্বীয় মালিকানা বহির্ভূত বস্তু বিক্রি করা।

৩. পানির মধ্যে মাছ রেখে বিক্রি করা।

৪. গাভী,বকরী ও উটনির স্তনে দুধ জমা করে ফুলিয়ে বেশী দামে বিক্রি করা।

৫. হারিয়ে যাওয়া জীব- জন্তু বিক্রি করা।

ইসলামী বীমার বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ -

১. শুধু শরীয়ত অনুমোদিত খাতা সমূহে ইসলামী পদ্ধতিতে কোম্পানীর মূলধন ও উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ করবে।

২. একটি "শরীয়াহ্ কাউন্সিল" কোম্পানীর কার্যবিধি পরিচালনা করবে এবং বৈধ ও অবৈধ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিবে।

---

[২৪] হেদায়া, কিতাবুল বুয়ু।

Dhaka University Institutional Repository

৩. কোম্পানীর শেয়ার মালিকদের মূলধন বীমা গ্রাহকের মূলধন থেকে আলাদা সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ করা হবে।

৪. বীমা গ্রাহকগণের প্রদত্ত চাঁদা হতে গঠিত তহবিল সংরক্ষিত তহবিলের বিনিয়োগ জনিত লাভের অংশ চুক্তির শর্ত ও পরিচালকগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বীমা গ্রাহকদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

৫. বীমা গ্রহীতাদেরকেও বীমা কোম্পানীর মালিক বলে স্বীকার করা হয়।

৬. পরিচালনা পরিষদে বীমা গ্রহীতাদের মধ্যে হতে সদস্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

৭. কি হারে লাভ বন্টন করা হবে তা চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

৮. ইসলামে নিষিদ্ধ কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাবে না।

৯. উদ্বৃত্ত বা লাভে পলিসি হোল্ডারদের অংশ গ্রহণের অধিকার থাকবে।

১০. শেয়ার মুলধন, রিজার্ভ ও লাভ থেকে বার্ষিক ২.৫% হারে যাকাত আদায় করতে হবে এবং শরিয়তের অনুমোদিত খাতে তা ব্যয় করতে হবে।

একটি ব্যবসায়ীক উদ্যোগ হিসেবে ইসলামী বীমা বা তাকাফুল ব্যবস্থা ইসলামী মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত। যাতে মূলধন যোগনদাতা ও ব্যবসায়িক সংগঠনের মাধ্যমে পারস্পরিক অংশিদারিত্বে লাভ ভাগাভাগি করে নেয়ার ব্যবস্থা আছে। এদিকে একই সঙ্গে বীমার সকল গ্রাহক বা সদস্যরা পরস্পরের সাথে সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সুতরাং ঘারার ইসলামী বীমার মধ্যে নূন্যতম সম্পর্কও নেই।

Dhaka University Institutional Repository

শরীয়াহ্ কাউন্সিল

ইসলামী ব্যবস্থাপনার যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্যে একটি শরিয়া বোর্ড থাকতে হবে। বিশেষ করে ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এর কোন বিকল্প নেই। বহিঃবিশ্বে কোন কিছু প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তারপর আমরা তা অনুস্মরণ করে থাকি। ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ । বর্তমানে ব্যাংক ও বীমা ছাড়াও কিছু কিছু কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে ইসলামী শরীয়াহ্ বোর্ড দ্বারা পরিচালিত দেখা যায়। সুদ ভিত্তিক পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত এমন অনেক প্রতিষ্ঠানেও ইসলামী যুক্তকরণ চলছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান যদি সুদের মানসিকতা পরিবর্তন করে সত্যিকারভাবে ইসলামী পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়ার লক্ষ্যে শরীয়াহ্ মূলনীতি প্রবর্তনের চিন্তা করে তাহলে নিঃসন্দেহে এটি একটি ভাল লক্ষণ। আর যদি জনগণকে ধোকা ও প্রতারিত করতে অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এরূপ করে থাকে তাহলে তা হবে আল ঘারার। যা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কাজ ইসলামী বিধিবিধান মত পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে শরিয়াহ্ কাউন্সিল গঠন করা হয়।

সুদান সরকার ইসলামী বীমা আইনের সাথে শরীয়াহ্ কাউন্সিল আইন ও পাশ করে। ইসলামী বীমা পরিচালনা বোর্ডের ও শরিয়াহ্ কাউন্সিল বোর্ডের সদস্যগণ আয়করমুক্ত।

মালয়েশিয়ার তাকাফুল Act 1984 - তে শরীয়াহ্ কাউন্সিল সম্পর্কে বলা হয়েছে -

That there is in the Articles of Association of the Takaful operator concerned provision for the establishment of a Shariah supervisory council to advise as operator on the operations of its Takaful business in order to easer that it does not involve in any element which is not approved by the Shariah.

"তাকাফুল কোম্পানী সমূহের সংঘ বিধিতে একটি শরিাহ্ সুপারভাইজরী কাউন্সিল গঠনের উল্লেখ থাকবে, যারা শরীয়াহ বিরোধী কোন উপাদান না থাকা নিশ্চিত করতে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃকপক্ষকে পরামর্শও উপদেশ দিবে।

শরীয়াহ্ কাউন্সিল এমন একটি প্রতিষ্ঠানিক অবকাঠামো যে, বোর্ডের ব্যক্তিগণ হবেন ইসলামী শরিয়াহ্ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও ইসলামী বাণিজ্যিক আইন সম্পর্কেও অভিজ্ঞ। সেখানে

Dhaka University Institutional Repository

থাকবে তাদের স্বাধীন সত্তা।বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য দেশেও রয়েছে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ শরিয়াহ্ বোর্ড।

শরীয়াহ্ বোর্ডের কার্যবলী ঃ

ইসলামী বীমার শরীয়াহ বোর্ড নিম্ন লিখিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে।

১. ইসলামী বীমার যাবতীয় কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা এবং যে ক্ষেত্রে শরীয়াহর বিধান লঙ্গিত হয় তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ দেয়া।

২. ইসলামী বীমা এবং এতদসংক্রান্ত কোন বিষয়ে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বা প্রকল্প অনুমোদনের জন্যে শরীয়া বোর্ডে পেশ করা হলে তা শরীয়াহ সম্মত কিনা খতিয়ে দেখা এবং কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া।

৩. ইসলামী বীমার বিভিন্ন বিভাগ থেকে ইস্যুকৃত সার্কুলার বা প্রজ্ঞাপন জারী করার পূর্বে তা শরীয়াহ্ সমার্থিত কিনা খতিয়ে দেখা।

৪. বীমা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প, সিদ্ধান্ত, প্রজ্ঞাপন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি ইসলামী শরীয়াহর পরিপন্থি হলে তা বাতিল করা।

৫. ইসলামী বীমা ব্যবসা বাণিজ্য প্রকল্প গ্রহণ বিনিয়োগ পদ্ধতি আন্তর্জাতিক ব্যবসা পরিচালনা, পারস্পরিক অধিকার, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন পরামর্শ ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা করা।

৬. ইসলামী বীমার ইসলামী শ্রমনীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তথা কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ভাতা, কাজের সময় সূচী চাকুরী প্রদান, চাকুরীচ্যুতি, সাময়িক বরখাস্ত, শ্রমিকদের অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কায়েম হচ্ছে কিনা তা তদারকী করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

৭. শরীয়াহ বোর্ড বীমার কার্যক্রমকে যে পদ্ধতিতে অনুমোদন দিয়েছে বীমার সার্বিক কার্যক্রম সে অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা তদারক করা এবং শরীয়াহ নীতিমালা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮. ইসলামী বীমা অফিসে নামাজ কায়েম সহ অন্যান্য মৌলিক বিষয়াদি কায়েম আছে কিনা তা তদন্ত করা এ প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশ দেয়া।

৯. ইসলামী বীমা সার্বিক কার্যক্রম ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক পরিচালিত হয় কিনা বছরে দু বা ততোধিকবার অডিট করা। একে শরীয়াহ্ অডিট বলা হবে। এতদসংক্রান্ত কাজের জন্যে শরীয়াহ বোর্ড প্রয়োজনীয় জনশক্তি কাজে লাগবে এবং বীমা কোম্পানী এর ব্যয় ভার বহন করবে।

১০. শরীয়াহ বোর্ডের প্রত্যেক সম্মানিত সদস্যকে স্বরণ রাখতে হবে যে, ইসলামের একটি মহৎ ও বৃহৎ কাজের বোঝা তাদের উপর অর্পিত হয়েছে। সুতরাং বীমাতে শরীয়াহ বিরোধী কোন কার্যক্রম সংঘটিত কিংবা চর্চা হলে এ জন্যে শরীয়াহ বোর্ড ও বোর্ডের সদস্যগণই দায়ী থাকবে। এর জন্যে পরকালে ও শাস্তি ভোগ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমার আইনগত ভিত্তি

(ক) বীমা কোম্পানীর নিকট প্রিমিয়ামের দেয়া টাকা আমানত হিসেবে জমা থাকবে। আর এ আমানত হবে বীমাগ্রহীতার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার উপায়। বীমাগ্রাহকের মৃত্যু হলে এ আমানত তার ওয়ারিশদেরকে ফেরত দেওয়া হবে। অথবা মেয়াদান্তে, তা বীমা গ্রাহককে ফেরৎ দিতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেছেন[২৫] - ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها -

অর্থাৎ নিশ্চাই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ করেন যে তোমাদের নিকট রাখা আমানতকে তার প্রাপকের নিকট ফেরৎ দিবে।

(খ) আল্লাহর সৃষ্টিকূলের মধ্যে একমাত্র মানবজাতি সমাজ বদ্ধ ভাবে বসবাস করে। একটি সমাজে ধনী গরীব সুখি-দুঃখি অনেক প্রকৃতির মানুষ থাকে। আর এ সমাজের প্রত্যেকেই জীবনের কোন একসময় বিপদ মুসিবতের সম্মুখিন হতে হয়। একজন মানুষ যখনই বিপদে পড়বে তখন অন্য জনের সামর্থ অনুযায়ী বিপদ কবলিত ব্যক্তিকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। এ সমযোগিতা করাকে আল্লাহ তায়ালা ফরজ বা আবশ্যক করে দিয়েছেন। আল্লাহ- তায়ালঅ বলেছেন[২৬] - وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان -

অর্থাৎ তোমরা সৎ ও খোদা ভীতিপূর্ণ কাজে একজনকে অপর জন সাহায্য কর। শত্রুতা ও অন্যায়ের কাজে একজন অপর জনকে সাহায্য করো না।

(গ) দুর্যোগ কালীন সময়ে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতর ব্যবস্থাপনা থেকেই বীমার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামের আগমনের পূর্বে আরব গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতার বিষয়টি পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল যা আকিলা নামে পরিচিত। রাসুল (সঃ) আরবের এ আকিলা প্রথাকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বনি হোজাইল গোত্রের দু'জন মহিলার হত্যা সংক্রান্ত বিবাদ

---

[২৫] আল কুরআন, সুরা আন্ নিসা - আয়াত- ৫৮
[২৬] আল কুরআন, সুরা আল-মায়েদা-২

Dhaka University Institutional Repository

মিমাংসা করেছেন আকিলা ব্যবস্থার মাধ্যমে করেছেন। মিমাংসা সম্পর্কে রাসুল (সঃ) থেকে উল্লেখ আছে[২৭] - عن ابى هريرة رض قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احدى الاخرى فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا الى النبى ص فقضى ان دية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها وورثتها وولدها ومن معهم (المسلم) -

অর্থাৎ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন হোযাইল গোত্রের দু'মহিলা ঝগড়া করে একজন অপরজনকে পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরের আঘাতে - অপরজন গর্ভ সহ মারা যায়। নিহত মহিলার উত্তরাধিকারীগণ রাসুলে খোদা (সঃ) এর নিকট বিচার দায়ের করে। রাসুলে খোদা (সঃ) গর্ভের সন্তান হত্যার দায় হিসেবে এক ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিহত মহিলার দায় হিসাবে রক্ত পণ পরিশোধ করতে হত্যাকারীর আকিলাকে, উত্তরাধিকারীদেরকে, সন্তান দেরকে এবং এ সব আত্মীয়দের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ আকিলা প্রথারই আধুনিকায়ন হল বর্তমান বীমা ব্যবস্থা। তাই ইসলাম, ইসলামী পদ্ধতির বীমা ব্যবস্থাকে অনুমোদন করে।

(ঘ) গোষ্ঠি বদ্ধ ভাবে সহযোগীতার বিধান পূর্ব আরব জাতির মধ্যে ও বিদ্যমান ছিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোন প্রচলিত বিষয় ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে ইসলামে তা গ্রহণ যোগ্য । ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও সামাজিক প্রচলনকে ইসলামী বিধান প্রণয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন। পূর্ব থেকে বীমার প্রচলন থাকলে ও তাকে ইসলামী আইনে সংস্কার করে জন কল্যাণকর হিসেবে পরিণত করা যায়। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুল (সঃ) বলেছেন[২৮]- - ما راى المسلمون حسن فهو عند الله حسن

অর্থাৎ যাকে মুসলমানগণ কল্যাণকর বা বা উত্তম মনে করে তা আল্লাহর নিকট ও কল্যাণকর বা উত্তম।

---

[২৭] মুসলিম শরীফ বুখারী শরীফ কিতাবুদ দীয়াত।

[২৮] রওযাতুন নাজির, ইবনে কুদামা।

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) বীমা শিল্পের সাথে যদি কোন হারাম উপাদান বা ইসলাম সাংঘর্ষিক কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে বীমা বৈধ হবে। এ সম্পর্কে জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সুয়ুতি তার আল আশবাহ্ ওয়ান্ নাযায়ের গ্রন্থে বলেছেন[২৯] - الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم -

অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুতে কোন হারাম সূচক বিধান সম্বলিত হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত তা হালাল থাকে।

(চ) মানুষের সামাজিক ও আর্থিক চাহিদা পূরণ করতে সহজ ও সাবলীল উপায় উপকরণ গ্রহণ কর প্রয়োজন। এতে কঠোরত ও বাড়াবাড়ী করা যাবেনা। এ সম্পর্কে আল্লাহ সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন[৩০] - يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر -

অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের জন্যে সকল বিষয় সহজ করতে চান এবং কঠিন করতে.চান না।

(ছ) ইসলামী বীমা সমাজ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বর্তমানে এ প্রয়োজনিয়তা অপরিসীম । আমরা ইসলামী বীমা থেকে পিছিয়ে থাকলে পাশ্চাত্য বীমা প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশের অর্থে তাদের সামাজিক উন্নয়ন করার এক বিরাট সুযোগ গ্রহণ করবে। ইসলামে প্রয়োজনে আপেক্ষিক বিষয় গুলোকে ও মোবাহ্ করে দেয়।

الضرورة تبيح المحظورات -

" প্রয়োজন নিষিদ্ধ বস্তুকে ও বৈধ করে" ।

---

[২৯] আল আশবাহ্ ওয়ান নাযায়ের, দারুল কুতুব আল আলামিয়াহ্, লেবানন, ১৯৮৩, পৃ. ৬০
[৩০] আল কুরআন, সুরা আর বাকারা - আয়াত ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

আইনগত ও দক্ষতা জনিত সমস্যা

বাংলাদেশে ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে দু'টি সমস্যা প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করতে হয়। দেশের প্রচলিত আইনের বাধাও দক্ষ জন শক্তির অভাব।

প্রথমতঃ আইনগত বাধা ঃ বাংলাদেশে ইসলামী বীমা ব্যবস্থা চলছে পূর্ববর্তী বীমা আইনের অধীনে। ১৯৩৮ সালের বীমা আইন ও ১৯৫৮ সালের বীমা বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে বৃটিশ সরকারের তত্ত্বাবধায়নে। এ আইনের অনেক গুলো দিকই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক তবু ও শরীয়াহ কাউন্সিলের সদস্যগণ প্রচলিত আইনের ধারা ঠিক রেখে ইসলামী নীতি মালা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। কিন্তু শরীয়াহ কাউন্সিলের কোন বিধান রাষ্ট্রীয় আইনে নেই। ফলে শরীয়াহ কাউন্সিলের নীতিমালা পালনে কোম্পানী গুলো বাধ্য নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক বীমা কোম্পানী ইসলামী বীমা প্রকল্প চালু করেছে। তাদেরকে কোটি কোটি টাকার কাজে করতে হচ্ছে। সরকার এর জন্যে প্রয়োজনীয় আইন পাশ না করায় বীমা দলিল, প্রস্তাব পত্র , নমিনী, মেডিক্যাল পদ্ধতি , সমর্পণ মূল্য, বীমা তামাদি হওয়া, লাভ-লোকসান ইত্যাদি বিষয়ে শরীয়াহ নীতি মালা বাস্তবায়ন সম্ভব হচ্ছে না। দেশে ইসলামী বীমা আইন নাথাকায় ইসলামী বীমা কোম্পানী জোড়াতালী দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করছে। আর বীমার গ্রাহকগণ ও পর্যাপ্ত সুযোগ -সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ইসলামী বীমা কোম্পানী গুলোর ইচ্ছে ও আন্তরিকতা থাকা সত্তেও এর সুফল মানুষের দৌড় গোড়ায় পৌছে দিতে পারছেনা।

মালয়েশীয় সরকার সে দেশে ইসলামী ব্যাংকও ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠার অনুমতি দানের পূর্বে ইসলামী ব্যাংকিং আইন ১৯৮৩ ও ইসলামী বীমা আইন ১৯৮৪ পাশ করে। বাংলাদেশে সংসদীয় ভাবে এখনো কোন ইসলামী ব্যাংকিং আইন ও ইসলামী বীমা আইন পাশ হয় নাই।

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্বরূপ বাংলাদেশ সরকারকে দেখিয়ে দিয়েছে। আগামীতে ইসলামী অর্থনীতিই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হতে পারে যদি সরকারের যাথেষ্ট সদিচ্ছা থাকে। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে অগ্রসর করতে ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বীমা আইন পাশ করা সরকারের একান্তই কতব্য।

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর কয়েকটি মুসলিম দেশে সাধারণ বীমা আইনের পাশাপাশির ইসলামী বীমা আইন চালু রয়েছে। এবং সে দেশ গুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নে উন্নত দেশ গুলোর কাছাকাছি পৌছ যাচ্ছে। প্রয়োজনে তাদেরকে মডেল হিসেবে সামনে এনে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ দক্ষ ও অভিজ্ঞ জন শক্তির অভাব ঃ বাংলাদেশে ইসলামী বীমা উন্নয়নের ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জন শক্তির অভাব একটি বিরাট সমস্যা। ইসলামী বীমা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রচলিত বীমা কোম্পানীর লোকজনই অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী বীমা কোম্পানীতে কাজ করছে। অপর দিকে ইসলামী মনোভাব সম্পন্ন অনেকেই কাজ করে যাচ্ছেন। উল্লেখিত দু'টি শ্রেণীর মধ্যে দু'ধরনের সমস্যা বিদ্যমান। প্রচলিত বীমায় অভিজ্ঞদের ইসলামী বীমার বা ইসলামী আদর্শের অভাব থাকায় ইসলামী বীমার স্বাতন্ত্র্যতায় বাধার সৃষ্টি হয়। অপর দিকে যারা ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন বা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী তারা বীমার টেকনিক্যাল বিষয়ে অত্যন্ত দুর্বল, ফলে বীমা শিল্প কাংখিত মানে উন্নতি হচ্ছে না।

ইসলামী ভাব ধারার যোগ্য লোক গড়ে তোলতে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার বিশ্ব বিদ্যালয় গুলোতে বীমা এর উপর অনার্স ও মাস্টারস কোর্স চালু আছে এবং বীমা এর উপর এম.ফিল ও পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী ও প্রদান করা হয়ে থাকে।[৩১] বাংলাদেশে ও বীমার উপর বিশ্ব বিদ্যালয় গুলোতে অনার্স ও মার্স্টাস কোর্স চালুকরার মাধ্যমে দক্ষ জন শক্তি তৈরী করা সম্ভব। একটি কথা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, Human Resource Development বা মানব সম্পদ উন্নয়ন ছাড়া বা দক্ষ জন শক্তি তৈরী ছাড়া কোন ব্যবস্থাই সঠিক ভাবে দাড়াতে পারেনা। ইসলামী বীমার বিষয় গুলো সাধারণ বীমার চেয়ে অনেক সুক্ষ্ণ। শুধু প্রস্তাব পত্র পূরণ করে বীমা করাই বীমার কাজ নয়। প্রস্তাব পত্র পুরণ পি, আর . এফ, পি আর, আন্ডার বাইটিং কমিশন, সার্ভিসিং বীমা দলিল, সুযোগ-সুবিধা, মৃত্যু দাবি, মেয়াদ পূর্তির দাবী ইত্যাদি অনেক গুলো বিষয়ই বীমা কোম্পানীর কাজ। ইসলামী বীমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম করার সুযোগ নেই। এ বিষয় গুলো সম্পূর্ণ রূপে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতেই একদল দক্ষ জনশক্তি গঠন অত্যন্ত জরুরী। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বীমা কে পাঠ্য সূচী করার উদ্যোগ ছাড়া ও সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত বাংলাদেশ ইন্সিউরেন্স একাডেমীতে ইসলামী বীমার উপর আরো প্রশিক্ষণ কোর্স

[৩১] ইসলামী বীমার মৌলিক ধারণা ও কর্ম কৌশল, ডঃ আ. ই. নেহার উদ্দিন, পৃ: ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

চালু করার ব্যবস্থা করা দরকার। Islamic Insurance Development Course চালু এবং বীমা অধিদপ্তরে বীমা বিভাগ নামে পৃথক Wing খোলা দরকার। আন্তর্জাতীক বীমা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানেও এ বিষয়ে পড়াশোনার ও গবেষণার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন, সরকারী উদ্যোগ ছাড়াও Human Resorce Development (মানব সম্পদ উন্নয়নে) ইসলামী বীমা কোম্পনী গুলো যথেষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। এ ক্ষেত্রে ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্সিউরেন্স কোং লিঃ এক অনন্য ভূমিকার দাবিদার। তারা নিজেদের উদ্যোগে কোম্পনীর মাঠ ও ডেস্ক কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও মান উন্নয়নের লক্ষ্য অনবরত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। পৃথক Training and researce Development স্থাপন করে বিভিন্ন বিষয়ে উপর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার পাশাপাশি গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এ উদ্যোগের ফলে তারা ভাল ফলাফল ও লাভ করছে। সকল ইসলামী ইন্সিউরেন্স কোম্পানীর সম্মেলীত প্রচেষ্টায় একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বীমা একাডেমী স্থাপনের মাধ্যমে ও দক্ষ জন শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব/ইসলামী বীমা কোম্পানী গুলোর পক্ষ থেকে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করবে। এ কমিটি বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে বীমাকে পৃথক একটি কোর্স হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করতে কর্তৃপক্ষকে উদ্ধুদ্ধ করবে। এভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জন শক্তির অভাব জনিত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

বীমাকারীদের বীমা গ্রাহকের সাথে অঙ্গিকার জনিত সমস্যা ঃ ইসলামী বীমার কর্মীরা গ্রাহককে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে কোম্পানীর দেয়া সুযোগ সুবিধা ছাড়া ও অনেক মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে থাকে যা আদৌ পুরণ করা হয় না। তাই একবার কেউ এ মিথ্যা আশ্বসে পড়লে সে অন্যদেরকে বীমা করা থেকে নিষেধ করে থাকে।

ইসলামী বীমা এদেশে ছিলনা। এদেশের কিছু ইসলামী মনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তির উদ্যোগে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদেরকে লেন-দেন অফিস ব্যবস্থাপনা, সততা, ন্যায় নিষ্ঠা ও শরিয়াহ্ বাস্তবায়ন সহ্ সামগ্রীক বিষয়বলী ইসলামী করণে দায়িত্ব পালন করতে হবে। বক্তৃতা, বিবৃতি, পোষ্টার হ্যান্ডবিল, প্রচার, পরিচিতি ইত্যাদিতে যে কথা বলা হবে তা প্রতিপালিত করতে হবে না হলে ইসলামী করা সম্ভব নয়।আল্লাহ বলেছেন[৩২] - يا أيها

[৩২] আল কুরআন, সুরা আস্‌সফ, আয়াত - ২

Dhaka University Institutional Repository

الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون - كبر مقتا عند الله
ان تقولوا ما لا تفعلون -

অর্থাৎ হে ইমানদারগণ! তোমরা যা পালন করনা তা কেন বল ? আল্লাহর নিকট জঘন্য গুনাহ যে, তোমরা যা করবে না তা বলবে।

সুরা মায়েদাহ এর প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন[৩৩] -

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود -

অর্থাৎ হে ইমানদারগণ! তোমরা তোমাদের কৃত অঙ্গিকার পূরণ কর।

তাই যারা শরীয়তের কথা বলে ইসলামী বীমা নিয়ে ময়দানে নেমেছেন তার বিপরীতে গ্রাহকগণ প্রতারিত হচ্ছে কিনা তাও তাদেরকে দেখতে হবে।

আর যে কর্মীর মিথ্যা আশ্বাস প্রামাণিত হয় তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে যেন অন্য কেউ আর মিথ্যার আশ্রয় না নিতে পারে।

নাম সর্বস্ব ইসলামী বীমা ইসলামী বীমা প্রকল্প ঃ এ দেশে ইসলামী বীমার অগ্রযাত্রা ও উন্নতি লক্ষ্য করে কিছু কিছু বীমা কোম্পনী তাদের কোম্পানীর সাইনবোর্ডে ইসলামী সংযোজন করেছে বা ইসলামী বীমা নাম সর্বস্ব প্রকল্প খুলেছে। এদের উদ্দ্যেশ্য কিন্তু ইসলামী শরিয়াতের বাস্তবায়ন নয়। এরা মুলত প্রতারণার মাধ্যমে গ্রাহকেদের আকৃষ্ট করতেই ইসলামকে ব্যবহার করছে।

এ দেশে ইসলামী বীমা আইন করে এদেরকে প্রতিহত করতে হবে এবং শরীয়ত বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বীমা গুলোর পক্ষ থেকেও গণ সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকরী পদক্ষেপ নিত হবে । না হলে ইসলামী বীমার প্রতি মানুষের আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

প্রিমিয়াম জনিত সমস্যা ঃ প্রিমিয়ামজনিত এমন কিছু মূল সমস্যা রয়েছে যার কারণে মানুষ ইসলামী বীমার প্রতি আগ্রহী হচ্ছে না। কারণগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. বীমা গ্রহাক তার প্রিমিয়াম ১/২ বছরের কম চালানোর পর সামনে চালাতে যদি অক্ষম হয় তা হলে সে বীমা কোম্পানী থেকে কিছুই ফেরৎ পায় না।

---

[৩৩] আল কুরআন, সুরা আল মায়েদা, প্রথম আয়াত,

Dhaka University Institutional Repository

২. মৃত ব্যক্তির ২/৩ কিস্তির প্রিমিয়ামের টাকা জমা না দিলে মৃত্যু দাবি পরিশোধ করা হয় না।

৩. অনেক ইসলামী বীমা কোম্পানী গ্রাহকদেরকে ২/৩ বছর প্রিমিয়ামের টাকা একাধারে চালিয়ে গেলে পরবর্তী পর্যায়ে ৬০% লোন দেয়া হবে বলে আশ্বাস দেয়। কিন্তু বাস্তবে তা দেয়া হয় না।

৪. কোন কোম্পানী লোন দিলে ও তা সুদের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

৫. প্রিমিয়ামের হার বেশী।

সমাধান ঃ

অনেক ইসলামী বীমা কোম্পানী মাসিক প্রিমিয়ামের ব্যবস্থা করেছে যেমন পপুলার লাইফ ইন্সিউরেন্সের আল আমিন বীমা প্রকল্প। বর্তমানে কোন বীমা গ্রাহক যদি ২ বছরের কম প্রিমিয়াম চালিয়ে তার পরবর্তী কিস্তি সমূহ চালাতে অক্ষম হয় তাহলে সে বীমা কোম্পানী থেকে কিছুই পাবে না। আর যদি ২ বছরের বেশী কিন্তু চুক্তিবদ্ধ মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে কোন কারণে অক্ষম হয় তাহলে জমাকৃত টাকা সে মেয়াদান্তে পাবে। ২ বছরের বেশী যারা প্রিমিয়ামের কিস্তি পরিশোধ করেছে তারা মেয়াদান্তে পাবে বললেও যারা ২ বছরের কম দিয়েছে তারা কিছুই পাবে না। এ সম্পর্কে বীমা কোম্পানীগুলো যুক্তি দেখায় যে তাদের অফিসিয়াল খরচের কারণে তারা তাদেরকে কিছু দিতে পারছে না। বিশেষ করে বীমাকর্মীদের কমিশনেই অনেক টাকা চলে যায়।

এ বিষয়টি মোটেও ইসলাম সম্মত নয়। যদি ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো শরীয়াতের বাস্তবায়ন না করে বেশী লাভের চিন্তা থাকে তাহলে প্রচলিত বীমার সাথে তাদের কোন পার্থক্যই থাকল না।

বীমা গ্রাহকদের প্রিমিয়ামের টাকা ৭০% এরও বেশী বীমা কর্মীদেরকে কমিশন হিসেবে দিতে হয়। পরবর্তীতে গ্রহাকের ফান্ডে তেমন কিছুই জমা হয় না। এটি নিছক একটি কমিশন বাজি, যার ফলে গ্রাহককে খেসারত দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সম্মত ব্যবস্থা হল বীমা কোম্পানী কর্মীদেরকে নির্দিষ্ট বেতন ধার্য করে দিতে হবে। বীমা কর্মীগণ গ্রাহকের সম্পূর্ণ টাকাই কোম্পানীর নিকট জমা দিবে। কোম্পানী মাস শেষে কর্মীদেরকে নির্দিষ্ট হারে বেতন দিবে। গ্রাহক প্রিমিয়াম চালাতে অক্ষম হলে ব্যবস্থাপনা খরচ ছাড়া বাকী টাকা তাকে ফেরৎ দিবে। যদিও সে একটি মাত্র প্রিমিয়াম দিয়ে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকের অনুস্বরণে বীমা গ্রাহকের প্রিমিয়ামের টাকার লেন-দেন করতে হবে। বীমাগ্রাহক যখন চায় তখনই ব্যবস্থাপনা খরচ বাবদ সামান্য অংশটি রেখে বাকী অংশ তাকে ফেরৎ দিতে হবে।

১. মৃত্যুদাবি পরিশোধে কোন তালবাহানার আশ্রয় নেয়া যাবে না। যদি কোন ব্যক্তি ২/৩ কিস্তির টাকা জমা না দিয়ে থাকে তাহলে তদন্ত করে জানতে হবে তার না দেয়ার কারণ। যদি অক্ষম তা জনিতকারণে না দিতে পারে তাহলে তার মুত্যু দাবি পরিশোধ না করলে গোষ্টীবদ্ধ সহায়তার নিমিত্তে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বীমা হবে না। কারণ এখানে সহায়তা না করে শোষণের আশ্রয় নেয়া হল । যা ইসলাম সম্মত নয়। তাই মুত্যু দাবি পরিশোধ করাই ইসলামের দাবী।

২. লোন দেয়া ঃ কোম্পানীর যদি লোন দেয়ার কোন ব্যবস্থা থাকে তা হলে বীমা কর্মী বীমা গ্রাহকের নিকট লোনের কথা উল্লেখ করতে পারে শুধু লোন নয় গ্রাহকের নিকট কোম্পানীর সমস্ত কার্যাবলী স্পষ্ট হতে হবে। কোন ক্ষেত্রে কোন মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয় কিনা তা কোম্পানী তীক্ষ্ম ভাবে নজরদারী করবে।

৩. সুদ ভিত্তিক লোন ঃ কোন কোন ইসলামী বীমা কোম্পানী লোন দিয়ে থাকলে ও তা শরিয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে না হয়ে সুদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোম্পানী লোন বাবদ কোন টাকা গ্রাহককে সরবরাহ করতে পারবে না। কোম্পানীকে লোনের পরিবর্তে পণ্য সরবরাহ করতে হবে। এ পণ্য সরবরাহ সহজ ও সাবলীল হতে হবে। যেন কোন প্রকারেই সুদের পর্যায়ে না পড়ে। তবেই মানুষের মাঝে ইসলামী বীমা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার সৃষ্টি হবে।

৪. প্রিমিয়ামের হার ঃ প্রিমিয়ামের হার বেশী থাকায় মানুষ এক সাথে টাকা দিতে পারে না বলে বীমা থেকে দূরে থাকে। বীমা কোম্পানীগুলোকে প্রিমিয়ামের হার কমিয়ে প্রত্যেকের দৌড় গোড়ায় বীমাকে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শেয়ার হোল্ডার ফান্ডের হিসাব পদ্ধতি ঃ সুদী বীমা কোম্পানী পলিসি হোল্ডার ও শেয়ার হোল্ডারদের ফান্ড একত্র করে ইসলামী দৃষ্টি কোণ থেকে তা ঠিক নয়। কারণ ইসলামী নীতি মালায় পলিসি হোল্ডারদের কে বীমা কোম্পানীর মালিক মনে করা হয়। তাই পলিসি হোল্ডার ফান্ড ও শেয়ার হোল্ডার ফান্ড আলাদা হতে হবে এবং আলাদা লেজার ও থাকতে হবে।

জেনারেল লেজার ছাড়া ও অন্যান্য সাবসিডিয়ারী লেজার সিডিউল এবং বিবরণীর মধ্যে থাকবে। (১) ক্যাশ বই (২) শেয়ার হোল্ডার ফান্ড লেজার (৩) স্থায়ী সম্পদ রেজিষ্টার (৪) বিনিময় সিডিউল (৫) ফাইনেন্সিয়াল সিডিউল (৬) ব্যাংক রিকন সিলিয়েশন স্টেটম্যান্ট।

------------ OO -------------

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে আর্থ ও সামাজিক সমস্যা

নিম্নে বর্ণিত বিষয়াবলী বাংলাদেশে সামগ্রিক বীমা শিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নিম্নে বর্ণিত সমস্যাগুলো প্রচলিত বীমার ক্ষেত্রে যেমন সমস্যা ইসলামী বীমা অগ্রগতির ক্ষেত্রেও তেমনি সমস্যা হিসেবে প্রতিয়মান হয়।

দুর্বল অর্থনীতি ঃ বীমা ব্যবসায়ের উন্নয়ন অর্থনৈতিক বিভিন্ন খাতের উন্নয়নের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অর্থনীতির সকল খাতই বিভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখিন। দেশের রপ্তানী আয় সীমিত এবং এ খাতের ৮০% অর্জিত হয় পোশাক ও নীটওয়ার খাত থেকে। অন্যান্য অর্থনৈতিক খাত যেমন কৃষি, খনিজ শিল্প, পরিবহণ প্রভৃতি খাত সমূহ দুর্বল রয়ে গেছে। এ অবস্থায় দেশে বীমা শিল্পের উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

মূলধনের অভাব ঃ বীমা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিপুল পরিমাণ পুজি থাকা প্রয়োজন অনেক বীমা কোম্পানীর সে ধরণের পুজি নেই। ফলে অধিক ঝুকিপূর্ণ কোন বীমা পলিসি গ্রহণে সমস্যা দেখা দেয়, এতে বীমা প্রবৃদ্ধির হার কমে যায়।

সঞ্চয়ের সীমিত হার ঃ বাংলাদেশের মানুষের মাথা পিচু আয় অনেক কম। এ দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। জীবন বীমা ও অন্যান্য বীমা জনগণের সঞ্চয়ের উপর নির্ভরশীল। এ কারণ জাতীয় সঞ্চায়ের সীমিত হার স্বাভাবিক ভাবেই বীমা শিল্পের উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করে।

শিল্প খাতের দূর্বলতা ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি মুলত কৃষি নির্ভর। এ দেশের শিল্প খাত অন্যান্য খাতের তুলনায় অনেক দুর্বল । দেশের মোট শ্রম শক্তির মাত্র ৭.৭% শিল্প শ্রমিক। অথচ অগ্নি বীমা ও দূর্ঘটনা জনিত বীমা সম্পূর্ণ রূপে শিল্প খাত সংশ্লিষ্ট। শিল্প খাতের দূর্বলতা বীমা শিল্পের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করে।

নৌ-বীমার সীমিত বাজার ঃ একটি দেশের আর্থিক লেন-দেনের অধিকাংশই হয়ে থাকে সমুদ্র পথে। আর সমুদ্রে একমাত্র পরিবহণ ব্যবস্থা জাহাজ। আমাদের দেশে এ ধরণের পরিবহণ সংস্থা নেই বললেই চলে। বিদেশী যে সব জাহাজ কোম্পানী রয়েছে তারা বিদেশী বীমা কোম্পানীর প্রতিবেশী আস্থাশীল।এ ক্ষেত্রে নৌ-বীমার বাজার সীমিতই থেকে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনা অদক্ষতা ঃ বাংলাদেশের প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রশাসনিক অদক্ষতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বীমা শিল্পের ক্ষেত্রে এ সমস্যা আরো প্রকট। তাই এদেশে সূচনালগ্ন থেকেই বীমা শিল্প বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ১৯৮৫ সালে পাশ হওয়া বেসরকারী আইনের আওতায় ১৯৯৯ সালে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠা হলেও ব্যবস্থাপনায় এখনো দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি।

প্রচার ও শিক্ষার অভাবঃ ইসলামী বীমাকে জনগণের নিকট আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে যে ধরণের প্রচার ও শিক্ষার প্রসার ঘটানো উচিৎ তা আমাদের দেশে কার্যতঃ নেই। এদেশের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যসূচীতে বীমা বিষয়ে কোন কিছু না থাকায় শিক্ষিত জনের কাছেও বীমা অজানা রয়ে গেছে এবং বীমা ব্যবসা অন্যান্য ব্যবসার মত তেমন একটা গুরুত্ব পায় নাই।

নৈতিক বিপর্যয় ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে নৈতিক অবক্ষয় প্রকটরূপ ধারণ করেছে। এটি বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বীমা গ্রহীতারা নিজেই বীমাকৃত সম্পদে আগুন ধরিয়ে দিয়ে অধিক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ আদায়ের চেষ্টা করে।

সমস্যাগুলো থেকে উত্তরণের উপায় ঃ বাংলাদেশের বীমা ব্যবসায় যে সব সমস্যা রয়েছে তা রাতারাতি কাটিয়ে উঠা সম্ভব নয়। এ জন্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রয়োজন। বিদ্যমান সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠে বীমা শিল্পকে জনপ্রিয় করে তুলতে নিম্নোক্ত কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। যেমন ঃ

বীমা ব্যবসায়ের আধুনিকায়ন ঃ এদেশে জন্ম থেকে বর্তমান পর্যন্ত বীমা ব্যবস্থা একই ধরনের রয়ে গেছে। এর উন্নয়নের জন্যে বীমা শিল্পে আধুনিকায়ন দরকার। এ কাজের অংশ হিসেবে জনগণও ব্যবসায়ীদের জন্যে অধিক সুবিধাজনক ও লাভজনক নতুন নতুন বীমা পলিসি প্রবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার উন্নত মডেল অনুস্বরণ করা যায়। এতে জনগণ ইসলামী বীমা শিল্পে আগ্রহী হবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর বীমা শিল্পের উন্নয়ন নির্ভরশীল। তাই শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহণ সহ অন্যান্য খাতকে দূর্বল রেখে বীমা শিল্পের উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। সকল ক্ষেত্রে সুদ ও আল ঘারার মুক্ত অর্থনীতির মাধ্যমে ইসলামী বীমাকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার প্রসার ঃ এদেশে ইসলামী বীমাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হলে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য সূচীতে বীমা বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। যার ফলে ছাত্রাবস্থায়ই শিক্ষার্থীরা বীমা সম্পর্কে তাত্তিক জ্ঞান লাভ করতে পারবে এবং জীবন বীমার দিকে ঝুঁকবে।

বীমা গ্রহিতাদের স্বার্থরক্ষা ঃ বাংলাদেশের বীমার ক্ষেত্রে কারচুপির নজিরও কম নয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা অনেক সময় ন্যায্য ক্ষতি পূরণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। আবার অসৎ দুর্নীতি পরায়ন কর্মকর্তাদের সাথে যোগসাজসে দূর্ঘটনার নাটক ঘটিয়ে দাবী আদায় করার প্রবণতাও লক্ষণীয়। আর একারণেই বীমা শিল্পের প্রতি জনগণের সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। বীমা কতৃপক্ষকে এর বিহিত ব্যবস্থা করে বীমা গ্রহীতার স্বার্থ রক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা করতে হবে।

নীতিমালা প্রণয়ন ঃ ইসলামী বীমা ব্যবস্থায় উন্নত দেশের ন্যায় এদেশেও ইসলামী বীমা আইন সরকারকে পাশ করতে হবে। বাংলাদেশে ১৯৮৫ সালের পর বেসরকারী পর্যায়ে বীমা ব্যবস্থা চালু হলেও বেসরকারী নীতিমালা প্রণয়ন হয়নি। বিদ্যমান বীমা আইনের সংস্কার করে ইসলামী বীমা আইন প্রণয়ন করা হলে জনগণ সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা লাভ করবে। ফলে বীমা শিল্পের দিকে মানুষ ঝুকে পড়বে।

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ঃ এদেশে বীমাশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বীমার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচরীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা যাতে ভাল করে জনগণের সামনে বীমার ভাল দিক গুলো ও উপকারীতা তুলে ধরতে পারে এবং বুঝাতে পারে তার প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা।

প্রচার ও আগ্রহ সৃষ্টি ঃ এদেশের মানুষের বীমা শিল্প সম্পর্কে অনাগ্রহ, ভুল ধারণা, সন্দেহ ও অবিশ্বাসকে কাটিয়ে উঠার জন্যে প্রচার কার্যক্রম অত্যন্ত জরুরী। বীমা পলিসি দ্বারা উপকৃত হয়েছে এমন লোকদেরকে গণমাধ্যমের সাহায্যে জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং পত্র-পত্রিকায় বীমার কল্যাণকর দিক গুলো তুলে ধরতে হবে। পর্যাপ্ত প্রচার ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে সাধারণ জনগণের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বীমার সাপ্তাহ্ পালন ঃ দেশের সকল ইসলামী বীমা কোম্পানীর উদ্যোগে বছরের সুবিধাজনক একটি সপ্তাহকে নির্ধারণ করে বীমা সপ্তাহ পালন করা যায়। এ বীমা সপ্তাহকে উপলক্ষে করে বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বীমা কোম্পানী গুলোকে। এতে সচেতন তা মূলক কার্যক্রম থাকবে । যেমন দাওয়াতী অভিযান, হ্যান্ডবীল বিতরণ, সিম্পোজিয়াম ও উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা। তবেই মানুষ ইসলামী বীমা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে সেদিকে ঝুকতে থাকবে।

আলোচ্য সমস্যাগুলো রেখে বীমা শিল্পকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। তাই সরকার ও বীমা কোম্পানী গুলোর যৌথ প্রচেষ্টায় আলোচ্য সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব। আর এ সমস্যা গুলোর সমাধানে বীমা শিল্পকে এদেশে জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব।

-----------OO------------

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

অবশেষে একথা নির্দিধায় বলতে পারি ইসলামের উন্নয়ন অর্থনীতি উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া ইসলামের যে কোন ধরনের উন্নয়নই অসম্ভব। বর্তমান বিশ্বে ব্যাংক ও বীমা অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করছে। আমাদের ইসলামী অর্থনীতি কথা চিন্তা করলেই ব্যাংক, বীমার দিকে নজর দিতে হবে। আর এগুলোকে Islamization করার মাধ্যমেই ইসলামী অর্থনীতির ভীত রচনা করতে হবে। বর্তমানে খ্যাতনামা মনীষী ও স্কলারগণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সকল খাতকেই গবেষণা ভিত্তিক Islamization করার লক্ষ্যে Islamic common market, Islamic currency, Islamic Banking, Islamic Bema (Takaful). প্রতিষ্ঠা করার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ সকল খাতকে ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা না করলে ইসলামী অর্থনীতিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়া যাবে না।

বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু হলেও অধিকাংশই ইসলাম সম্পর্কে সাম্যক ধারণা রাখে না। ইসলামী বীমা সম্পর্কে ও তেমন ধারণা নেই। অথচ বিশ্বে শতাধিক ইসলামী বীমা কোম্পানী সফল ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মুসলিম দেশ গুলোর মধ্যে উন্নত সকল দেশেই ইসলামী ব্যাংকের পাশাপাশি ইসলামী বীমা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে অভাবনীয় সফলতা অর্জন করে চলছে। মালয়েশিয়া, সুদানসহ কয়েকটি দেশে পৃথক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ইন্সিউরেন্স অধ্যাদেশ Act এর মাধ্যমে ইসলামী বীমা পরিচালিত হচ্ছে। মালয়েশিয়া গত একদশক ধরে দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। ইসলামী বীমার ক্রমবিকাশে ও উন্নতিতে অমুসলিম দেশেও ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালিত হচ্ছে। অষ্ট্রেলিয়া, লুক্সেমবার্গ, সিঙ্গাপুর, শ্রীলংকা, ইংল্যান্ড সহ অন্যান্য অমুসলিম দেশেও ইসলামী বীমার সফল প্রসার ঘটেছে। যখন সুদী অর্থব্যবস্থায় বিশ্ব পরিচালিত।বাড়ছে ধনী ও গরীবের মধ্যে অসম ব্যবধান। তখনই ইসলামী বীমা সাম্যের বাণী নিয়ে অবির্ভূত। সেখানে থাকবে না ধনী গরীবের কোন ব্যবধান একের বিপদে অন্যকে শোষণের পরিবর্তে সাহায্যের মানসিকতা। ইসলামী বীমা মুসলিম -অমুসলিম সকলের মনজয় করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের অনেক মনীষী ও স্কলারগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে গবেষণা ও লেখালেখির মাধ্যমে দিক নির্দেশনা প্রদান করে আসছেন । বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গুলো ইসলামী বীমা বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। মালয়েশিয়ার

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে ব্যাংকের মত ইসলামী বীমার জন্যে পৃথক বিভাগ রয়েছে। ইসলামী বীমার উপর ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে মানব উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশেও এক সময় ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে নেতিবাচক ধারনা ছিল। দু'দশক আগেও অনেকেই ধারণা করত সুদী কারবার ছাড়া ব্যাংক চলা অসম্ভব। আর দু'দশকের মাথায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে অভাবনীয় সফলতা লাভ করেছে। এমনকি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের লাভজনক শীর্ষ ব্যাংকে পরিণত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমা সম্পর্কে যারা নেতিবাচক ধ ারনা করেন তারা একথা ভাবেননি যে, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ অর্থব্যবস্থা দিয়েছে। যেখানে ব্যাংক ও বীমা থাকবে না সেখানে কি করে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করা সম্ভব? অথচ আধুনিক অর্থনীতি ব্যাংক ও বীমা ছাড়া কল্পনা করাও যায় না।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী চিন্তা চেতনা প্রসারের সাথে সাথে প্রতিদিন মানুষও অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ইসলামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ব্যাংক ও বীমার ক্ষেত্রে শরীয়াহ অনুসরণ না করে বিশ্বের এ ধাবমান জনগোষ্ঠিকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার স্বরূপ দেখানো সম্ভব নয়। সে চিন্তা ভাবনা থেকেই বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে গতিধারার সঞ্চার হয়েছে। সে ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও ইসলামী বীমার জনপ্রিয়তা এখন প্রচলিত বীমার তুলনায় অনেক ভালো। যার ফলে প্রচলিত বীমা গুলোর মধ্যে থেকে অনেক গুলো বীমা কোম্পানী ইসলামী বীমাতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং কতগুলো ইসলামী বীমা প্রকল্প নামে নতুন প্রকল্প চালু করেছে। বর্তমানে দেশের বিজ্ঞজন ও গুণীগণ স্বাভাবিক ভাবেই দ্রুত প্রসারী এ শিল্পকে নিয়ে চিন্তা ভাবনাও জোরালো করেছেন। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী গুলো দেশের প্রথিত যশা ওলামায়ে কেরামগণের মাধ্যমে শরীয়াহ বোর্ড গঠন করে। কোম্পানী এ শরীয়াহ কাউন্সিলের রেফারেন্স দিয়ে লোকজনকে বীমা পলিসি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। শরীয়াহ কাউন্সিলের পাশাপাশি যদি ইসলামী বীমা কোম্পানী গুলো মাঠ পর্যায়ে আলেমদেরকে নিয়ে আসতে পারে তাহলে বীমা প্রসারে অতি দ্রুত গতি লাভ করবে। এতে মানুষের মাঝ থেকেও বীমা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টি কোন থেকে যে সন্দেহ ও সংশয়ের জন্ম হয়েছে তা আর থাকবে না। এ সামষ্টিক চেষ্টা ও সাধানার দ্বারা একটি নব উদ্ভাবিত ব্যবস্থা যদি মানব কল্যাণের পথে সফল হয় তাহলে তা সমকালীন নয় পরবর্তী প্রজন্মের কল্যাণেও একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে।

= o=